বিশ্বসেরা সায়েন্স ফিকশন

ড. অমিত চক্রবর্তী



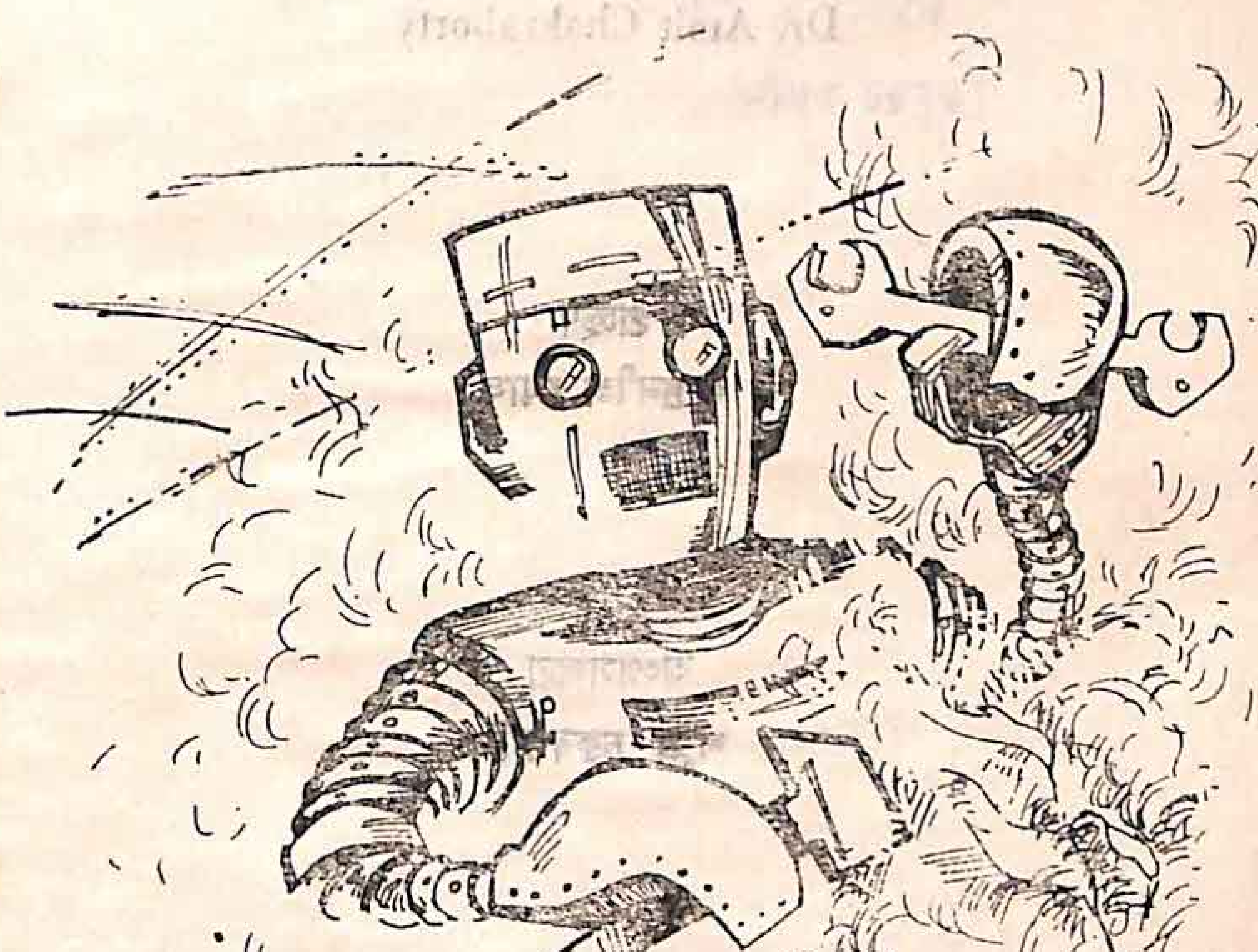
বিশ্বসেরা সায়েন্স ফিকশন

পত্র ভারতী

ড. অমিত চক্রবর্তী

বিশ্বসেরা সায়েন্স ফিকশন

পত্র ভারতী □ PATRA BHARATI



৩/১ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

এই লেখকের প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বই

সাত সমুদ্র (এন্‌সাইক্লোপিডিয়া সিরিজ)
আকাশভরা সূর্য তারা (ঐ)

দু-চার কথা

সায়েন্স ফিক্শনের বাংলা মানে করলে দাঁড়ায় বিজ্ঞান-সুবাসিত কল্পকাহিনী, অর্থাৎ শুধুই ফ্যান্টাসী বা কল্পনা নয়—বিজ্ঞানের মাল-মশলাও তাতে থাকা চাই। সায়েন্স ফিক্শনের জন্ম রূপকথার মধ্যে। রূপকথার লেখকরা কোন একসময় বিজ্ঞানের আলোয় নতুন করে রূপকথা লেখার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। এটা সেই সময়ের কথা, যখন বিজ্ঞান পাল্টাতে শুরু করেছে সমাজ, সভ্যতা আর সংস্কারকে। সাধারণ মানুষের মনে জাগছে ভয়-মেশানো কৌতূহল—এরপর কি হবে? এই কৌতূহলের সঙ্গে ছিল অজানা আর উদ্ভট জিনিসগুলিকে বিজ্ঞানের আলোয় যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার প্রয়াস। এই দুই-এর পরিণতি—সায়েন্স-ফিকশন। কল্পনা ছুটলো, তবে এবার আর বনবাদাড়ে এবড়ো খেবড়ো পথে নয়; বিজ্ঞানের চওড়া বাঁধানো সড়ক ধরে।

পৃথিবীর প্রথম সায়েন্স-ফিকশন কোনটি তার উত্তর দেওয়া মুশকিল। সায়েন্স-ফিকশন নিয়ে সমীক্ষা-মূলক বই—'নিউ ম্যাপ্স্ অফ্ হেল'-এ লেখক কিংস্লে অ্যামিস্ গ্রীক সাহিত্যের 'লুসিয়ান অফ্ সামাসোটা'-র লেখা 'স্ট্র-হিস্ট্রী'কে প্রথম সায়েন্স ফিকশন আখ্যা দিয়েছেন। কারণ এতেই ছিল প্রথম গ্রহান্তর যাত্রার বর্ণনা যদিও সেগুলি বিজ্ঞানের আলোয় যুক্তিগ্রাহ্য ঠেকবে না। এভাবে দেখলে, আমাদের রামায়ণ-মহাভারতেও সায়েন্স-ফিকশনের মালমশলার কমতি নেই। যাই হোক, মহাকাশ বিজ্ঞানী জোহান কেপলারের 'সোমনিয়ার'—যার বিষয়বস্তু ছিল চাঁদে যাবার বর্ণনা, তা ছিল অনেক বেশী বিজ্ঞান-নির্ভর। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে বিশ্বসাহিত্যে গ্রহান্তর আর পৃথিবীর অজানা প্রান্তের অদ্ভুত মানুষ আর জন্তু-জানোয়ারদের অজস্র কল্পকাহিনীর ভিড়! এদের মধ্যে 'গালিভার্স ট্রাভেল্স্'-এর সঙ্গে সম্ভবতঃ আমরা সবচেয়ে বেশী পরিচিত।

সায়েন্স ফিকশনের এইভাবে এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রথম ব্যতিক্রম মিসেস্ শেলীর লেখা 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'। এরপর সায়েন্স ফিকশনের জগতে এলেন এইচ-জি-ওয়েলস্। এ শতাব্দীর গোড়ায় আমরা পেলাম ফরাসী গল্পকার জুল ভের্ণকে। সায়েন্স ফিকশনকে গোটা দুনিয়ার পাঠকমহলের কাছে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে এই দুজনের অবদান অনেকখানি।

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৮৯

BISWASERA SCIENCE FICTION
(Science Fiction—An Anthology)
by
Dr. Amit Chakraborty

প্রচ্ছদ
ইন্দ্রনীল ঘোষ

অঙ্গসজ্জা
শুভ্র চক্রবর্তী

মূল্য
চৌদ্দ টাকা

'পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বন্ধু এবং সহযোগী
ড. সুভাষ সান্যালকে

অমিত চক্রবর্তী

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের পাঠকমহলের সঙ্গে জুল ভের্নের পরবর্তী যুগের লেখকের লেখা সায়েন্স ফিকশনের সঙ্গে তেমন পরিচয় ঘটেনি। গত তিনদশকে ইংরাজী এবং রুশ গল্পকারদের লেখা সায়েন্স ফিকশনের রূপরেখা আমাদের কিশোর পাঠক পাঠিকার কাছে তুলে ধরাই এ বই-এর উদ্দেশ্য। যেসব গল্প এই বই-এ স্থান পেয়েছে সেগুলি মূল গল্পের হুবহু অনুবাদ নয়। অনেক চেষ্টাতেও পল অ্যান্ডারসন, ব্রায়ান অ্যালডিস্, হারলান এলিসন কিংবা আনা-তলি দ্রেপ্রভের মতো লেখকদের কিশোরোপযোগী ছোট গল্প যে সংগ্রহ করা গেল না—সেজন্য আফশোষ হচ্ছে। ইংরাজী এবং রুশ ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষায় লেখা সায়েন্স ফিকশনকে এই বই-এর আওতায় আনতে না পারার জন্যেও মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

জানুয়ারি, ১৯৮৯ অমিত চক্রবর্তী

ছোট্ট মেয়ে অ্যান

মূল কাহিনী ঃ
উর্সুলা কে. লেগুইন

ওর আসল নাম 'অ্যান' ; বাবা ডাকতেন 'জুয়েল অ্যান' বলে। বছর ছয়েক বয়স অবধি বাবার কাছ থেকে প্রচুর আদর পেয়েছে ও।

ওর জন্মানোর দিনটার কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। আমার বয়স তখন ছ-বছর। মা যখন হাসপাতাল থেকে ওকে নিয়ে ফিরলো —বাবার চোখে-মুখে যেন খুশী ধরে না! আমারও আনন্দ কিছু কম হয়নি। সবসময় ওর পাশে পাশে ঘুরঘুর করতাম ; ওর কাঁথা পাল্টানো, জামাকাপড় ছাড়ানো, গায়ে পাউডার দেওয়া—এসব কাজে আপনা থেকেই মাকে সাহায্য করতাম। অ্যান ওর জীবনের প্রথম হাসিটা হেসেছিল, মা আর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। এবং সেজন্য আমার বেশ অহঙ্কারও ছিল। মা যখন দোকান-বাজারে যেতেন, অ্যান-কে পেরাম্বুলেটরে চাপিয়ে আমিও পাশে হাঁটতাম। তারপরে যেই ও একটু বড় হলো, আমার হাত ধরে হাঁটতে শিখলো —মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও দোকানে ঢুকতে শুরু করলাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই অ্যান তরতরিয়ে বেড়ে উঠে লম্বায় আমাকে ছুঁয়ে ফেললো। আমাদের ঘরকন্যার খেলায় ও তখন হতো 'মিসেস গুপী', আমি সাজতাম 'মিসেস বুপী'। গরমের ছুটির দুপুর-বেলায় আমাদের দুজনের খেলা জমতো বাড়ির পেছনের বাগানে। সে-সময় আমাদের তেমন সঙ্গী-সাথীও ছিল না। আমার থেকে দু-বছরের বড় দাদা 'ডুয়ান' অবশ্য আমাদের সঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে চলতো। কে জানে কেন অ্যানের চট্‌পট্‌ বেড়ে ওঠাটা বোধহয় ওর একেবারেই পছন্দ হয়নি। অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় আমাদের দু-বোনের মধ্যে ভালবাসার এক গাঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শরীরের মাপে আমার সমান সমান হয়ে যাওয়ার দরুনই বোধহয় অ্যান-কে সমবয়স্ক ভাবতে শুরু করেছিলাম আমি।

পাঁচ বছর বয়সে অ্যান প্রথম স্কুলে গেল আমারই হাত ধরে। ক্লাস-ঘরে ঢুকতেই দিদিমণি বলেছিলেন,—জুয়েল অ্যান, তুমি তো দেখছি দারুণ ঢ্যাঙা! দিদিমণির ঐ কথা কটার মধ্যে কেমন যেন

একটা বিদ্রূপের গন্ধ ছিল। আমার দিকে তাকিয়ে উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—সত্যিই কি তোমার বোনের বয়স পাঁচ বছর ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—লজ্জায় আমার কানটা লাল হয়ে গিয়েছিল।

পাঁচ বছরের পক্ষে ওর চেহারাটা খুবই বেমানান, কি বলো ?—ভদ্রমহিলা কেমন বিচ্ছিরিভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন ঃ ওর জন্য ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়েদের আবার অসুবিধে না হয় !

সেই সময় অ্যান হঠাৎ বলে উঠেছিল,—সামনের বছর আমার ছয় পূর্ণ হবে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে।—শিক্ষিকা মহিলাটি ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠেছিলেন ঃ যাও একদম পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসো।

জুয়েল অ্যান গিয়ে বেঞ্চে বসলো। দেখলাম, বসে থাকা অবস্থাতেই ওর মাথাটা দাঁড়িয়ে-থাকা ছেলেমেয়েদের মাথাগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে। ও যে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী লম্বা—তা সত্যিকারের টের পেলাম সেদিনই। সেই মুহূর্তে হঠাৎ আমার খেয়াল হলো—বাবা ওকে অনেক দিন আগেই 'মা-বুড়ী' বলে আদর করা বন্ধ করেছেন।

মনে আছে, এরপরই বাবা একদিন মাকে বলেছিলেন, অ্যানকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে। অ্যানের অমন তরতরিয়ে বেড়ে ওঠার ব্যাপারটা বাবার কাছে মোটেই যেন সুবিধের ঠেকছিল না। মা অবশ্য খানিকটা নিমরাজী হয়েই ডাক্তারের কাছে গিছিল এবং ডাক্তারও অনেক পরীক্ষা-টরীক্ষা করে অ্যানকে কতকগুলি হর্মোন-জাতীয় ওষুধ খেতে দিয়েছিলেন। তা, সেসব ওষুধ দু-চারদিন খাবার পরই অ্যানের মাথা ধরতে শুরু করলো ; তাছাড়া সবসময় কেমনযেন ঘুম-ঘুম ভাব। মা-ও অমনি ওষুধগুলো টপাটপ আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিল। মার ধারণা হয়েছিল—ঐসব হর্মোন-টর্মোন বেশী মাত্রায় শরীরে গেলে অ্যানের গালে দাড়ি গজাবে কিংবা গলার স্বর ভেঙে যাবে। আমার বিশ্বাস—ওষুধ ফেলে দেওয়ার ঐ ঘটনাটা বাবার অজানা ছিল। ফলে বেশ কিছুদিন পরেও যখন অ্যানের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটলো না—পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কেই বাবা কেমন উদাসীন হয়ে গেলেন। অন্য কোন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা বললেন না আর।

স্কুলে ভর্তি হবার পর প্রথম দুটো বছর জুয়েল অ্যানের ভালই কেটেছিল, বলতে হবে। পড়াশুনোর ব্যাপারে ওর কোন গাফিলতি ছিল না ; স্কুল কামাই করতো না একদিনও। ক্লাস থ্রিতে উঠতেই ওকে মনিটর বানিয়ে দিলেন দিদিমণিরা। ও তো দারুণ খুশী।

সেবছরই আবার ছবি-আঁকা প্রতিযোগিতায় যখন পুরস্কার পেলো—ওর আহ্লাদ আর ধরে না। ওর আচার-আচরণেও সকলে খুব সন্তুষ্ট ছিল ; তাহলেও, স্রেফ বেঢপ চেহারার জন্যই পরের বছর স্কুলের খাতা থেকে ওর নাম কাটা গেল। ব্যাস্, জুয়েল অ্যানের স্কুল জীবনের ওখানেই ইতি।

স্কুলে যেতে না পারায় জুয়েল অ্যান কোনরকম কান্নাকাটি করলো না। তবে ও যেন আগের চেয়েও বেশী চুপচাপ হয়ে গেল। বাড়ির সকলেরই ওর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল, একমাত্র ডুয়ান-ই ছিল যা কিছু ব্যতিক্রম। ঘাড় উঁচু করে আট-বছরের বোনের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে ও নিশ্চয়ই বেশ একটা হীনমন্যতায় ভুগতো। ডুয়ানের সঙ্গে আমারও যে খুব একটা বনতো তা নয়। ঝগড়ুটে স্বভাবের জন্য বাবার কাছে প্রায়ই পিটুনী খেতো ও। শেষ পর্যন্ত, ষোল বছর বয়সে একদিন বাড়ি ছেড়ে পালানো ডুয়ান। তারপর বহুদিন কোন খোঁজ খবর নেই ; শেষে একদিন মার নামে একটা চিঠি এলো অ্যাট্লাণ্টা থেকে। অস্পষ্ট হয়ফে ডুয়ান লিখেছে, ওর এক বন্ধু নাকি পৃথিবীর সব বিচিত্র জন্তু-জানোয়ারদের নিয়ে সিনেমায় ছবি তোলে ; বাবা-মা যদি চায় তবে জুয়েল অ্যান-কে নিয়েও একটা ছবি তোলানো যেতে পারে। পোষ্টকার্ডের পেছনে কোন ঠিকানা ছিল না ; ঠিকানা থাকলেও ডুয়ানের প্রস্তাবে সায় দিয়ে বাবা-মা কেউ চিঠি দিতো কিনা সন্দেহ। মা অবশ্য ঐ চিঠি পাবার পর দু-একদিন কান্নাকাটি করেছিল, তবে তার পেছনে ডুয়ানকে হারানোর শোক যত না ছিল, তার চেয়েও বেশী ছিল ডুয়ানের ছোটবেলার স্মৃতি-গুলোকে বয়ে বেড়ানোর দুঃখ। ডুয়ানের কাছ থেকে এরপর কোনদিন কোন চিঠিপত্র আসেনি আর।

স্কুল ছাড়ার পর জুয়েল অ্যান-কে বাড়ীতে রেখে পড়ানোর ব্যাপারে বাবা-মা দুজনেরই প্রথম প্রথম বেশ উৎসাহ ছিল। স্কুল থেকে কিছু বই-টইও বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম আমি। কিছুদিন পরই অবশ্য ওকে পড়ানোর ব্যাপারে বাবার উৎসাহে ভাঁটা পড়লো। বাবা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন—জুয়েল অ্যানের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। ইতিমধ্যে ওর নিজস্ব ঘরে আর কুলোচ্ছিল না বলে বাড়ির এক পাশের একটা ঘরের ছাদ ভেঙে এক পেল্লায় উঁচু ঘর তৈরী হলো ওর থাকার জন্য ; বাড়ির বাইরে থেকে সে ঘরে ঢোকার দরজাটা বানানো হলো দু-মানুষ সমান উঁচু করে ; তাতেও অ্যানকে কুঁজো হয়ে ঢুকতে হতো সেই ঘরে। বাড়ির চার পাশে প্রকাণ্ড উঁচু

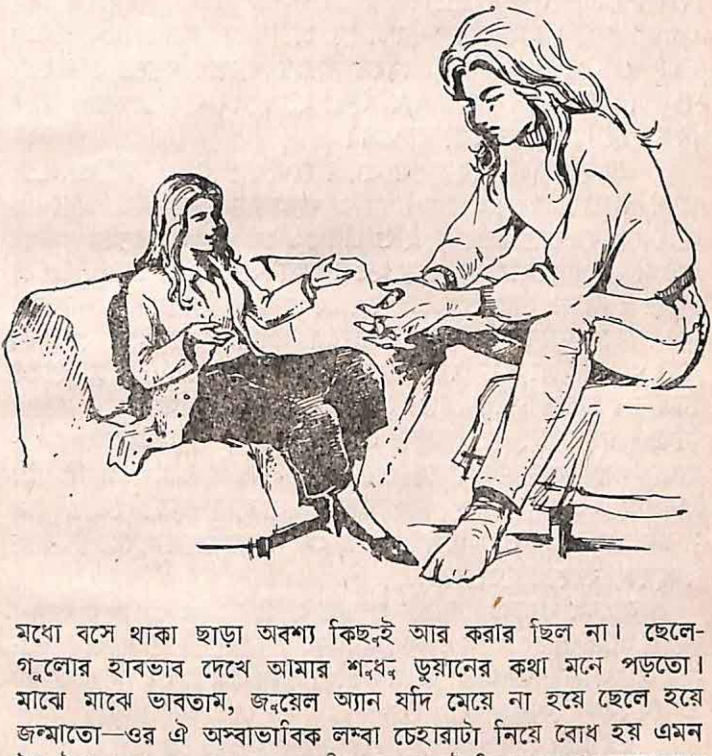
দেওয়াল তুলে দিয়েছিলেন বাবা। দিনের বেলা আমি যখন স্কুলে থাকতাম—অ্যান একা একা পায়চারি করতো ওর ঘরের লাগোয়া ছোট্ট বাগানটায়। স্কুল থেকে ফিরে এসেই আমার কাজ ছিল অ্যানের কাছে গিয়ে বসা। আমার মুখে বাইরের জগতের গল্প নিবিষ্ট মনে শুনে যেতো ও।

ঐসময় একদিন বিকেলে এক ভদ্রলোক এলেন আমাদের বাড়িতে। আমি তো রীতিমতো অবাক ; বাবার কোন বন্ধু-বান্ধব কখনো দেখিনি। বাবা-মা কোথাও যেতেন না বলেই আত্মীয়-স্বজন—পাড়া-প্রতিবেশীও কেউ আসতো না আর। বহুকাল পরে আমাদের বাড়িতে সেদিন বাইরের কোন মানুষের পা পড়েছিল। ভদ্রলোক নিজের থেকেই আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন, তারপর পকেট থেকে জুয়েল অ্যানের একটা ছবি বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন। ছবিটা দেখেই বুঝলাম—ও যখন ঘরের বাইরে ঘোরা-ফেরা করছিল তখন পাঁচিলের ওপার থেকে কেউ অজান্তে ওর ছবিটা তুলেছে। ছবিটা দেখেই বাবার মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। কোন্ কাগজের যেন রিপোর্টার উনি। অ্যানের ছবিটা তুলতে ওঁর কাগজের ফটোগ্রাফারকে যে কী কসরৎ করতে হয়েছে তা সবিস্তারে জানালেন। অ্যানের ইন্টারভ্যু-র ব্যাপারে বাবা কিন্তু আগ্রহী ছিলেন না। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে পীড়াপীড়ি করলেন, অ্যানের নামে একটা মোটা অঙ্কের চেক্ বাবার হাতে ধরিয়ে দেবার চেষ্টাও করলেন—শেষ পর্যন্ত বিফল-মনোরথ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং টিকিট করে সাধারণ লোক-জনের সামনে অ্যানেকে হাজির করলে কী পরিমাণ আর্থিক ল্যাভ হতো—সে সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বিদায় নিলেন। রাগে—উত্তেজনায় বাবার মুখ থম্‌থম্ করছিল ; নিজের ঘরে যাবার আগে মাকে শুধু বললেন, দিনের আলোয় অ্যান যাতে ঘরের বাইরে না বেরোয় সে ব্যাপারে নজর রাখতে।

রিপোর্টার ভদ্রলোক অ্যানের ইন্টারভ্যু নিতে না পারলেও ওর ছবিটা কাগজে ছাপার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই সঙ্গে অ্যান সম্পর্কে দু-চারটে মনগড়া কথা ; ওঁর লেখাটার শিরোনাম ছিল—'যে মেয়েটির মাথা পাইন গাছকেও ছাড়িয়ে যায়'। বাবা তো বাড়িতে কোন খবরের কাগজ আর না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তক্ষুনি ; ফলে, খবরের কাগজে পরবর্তীকালে অ্যান সম্পর্কে যা লেখালেখি হলো তার কোন খবরই আর পৌঁছলো না আমাদের কাছে।

খবরের কাগজে জুয়েল অ্যানের ছবি ছেপে বেরনোর পর প্রথম প্রথম বেশ কিছুদিন একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় বাধ্য হয়ে পড়তে হয়েছিল আমাদের। প্রায় প্রতি রোববারই বেশ কিছু লোক এসে জড়ো হতো আমাদের বাড়ির সামনে ; গেট দিয়ে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারতো তারা। ওদের মধ্যে সাহসী কেউ কেউ সরাসরি অ্যানের নাম ধরে হাঁকডাক করতো। সবচেয়ে বিরক্ত করতো হাইস্কুলের ছেলেরা। ওরা জুয়েল অ্যানের নাম ধরে বিশ্রী সব রসিকতা করতো, হাঃ হাঃ করে হাসতো। গেটে তালা ঝুলিয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে ঘরের



মধ্যে বসে থাকা ছাড়া অবশ্য কিছুই আর করার ছিল না। ছেলে-গুলোর হাবভাব দেখে আমার শুধু ডুয়ানের কথা মনে পড়তো। মাঝে মাঝে ভাবতাম, জুয়েল অ্যান যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হয়ে জন্মাতো—ওর ঐ অস্বাভাবিক লম্বা চেহারাটা নিয়ে বোধ হয় এমন হৈ চৈ হতো না। মেয়েরা বেশী লম্বা হলেই কি ছেলেদের অহঙ্কারে ঘা লাগে ?

মা বাইরে বেরনো প্রায় বন্ধই করেছিল ; সারাদিন ঘরের সমস্ত

কাজ এক হাতে সামলাতো। অগত্যা, দোকান বাজারের কাজটা আমাকেই সারতে হতো। ঘরকন্নার যাবতীয় জিনিষপত্র তো বটেই এমনকি আমাদের সকলের পোষাক-আসাক কেনার দায়-দায়িত্বও ছিল আমার ওপর। অ্যানের জন্য পোষাক কেনার অবশ্য প্রশ্ন ওঠে না ; আমি রঙীন কাপড়ের থান কিনে আনতাম ; মা সেগুলি কেটেকুটে অ্যানের মাপ-মতো ফ্রক বানিয়ে দিতো। একবার জিন্স্-এর প্যান্ট পরার খুব সখ হলো অ্যানের। আমি যখন দোকানে গিয়ে জিন্স্-এর একটা গোটা থান কিনলাম—কাউন্টারের লোকগুলো সব আমার দিকে কেমন হাঁ করে তাকিয়ে রইলো ; আর মোটা কাপড়ের সেই পেল্লায় স্তূপ বাড়ি বয়ে আনাটা কি চাট্টিখানি কথা! জিন্স্-এর সেই প্যান্ট বানাতে মাকেও সেবার দারুণ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। প্যান্টটা পেয়ে অ্যান অবশ্য খুব খুশী হয়েছিল। একবার পরলে আর কিছুতেই ছাড়তে চাইতো না ওটা।

এর কিছুদিন পর আমি একটা চাকরি পেলাম। অ্যানের বয়স তখন পনেরো বছর ; লম্বায় তখন ও পাক্কা পঁয়তাল্লিশ ফুট এবং ওর ঐ বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে ইতি টানারও কোন লক্ষণ নেই। আমার অফিসটা বাড়ি থেকে বহুদূরে হওয়ায় অফিস আর রাস্তাতেই দিনের অনেকটা সময় কেটে যেতো। রাত্রিবেলা বাড়ি ফেরার পর—আমরা সবাই মিলে খানিকক্ষণের জন্য জুয়েল অ্যানের ঘরে গিয়ে বসতাম। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'একটু পয়সা কড়ি হলেই নির্জন কোন সী-বীচ কিংবা ছোট্ট কোন দ্বীপে গিয়ে বাস করবো আমরা—কি বলিস্ ? আমাদের জুয়েল অ্যান-ও তখন খেয়াল খুশী-মতো ঘুরে বেড়াতে পারবে চারদিকে!' অবশ্য আমরা সবাই তো জানতামই এমন কি জুয়েল অ্যানও জানতো—সেটা কোন দিন সম্ভব হবে না ; তবু বাবার কথায় ওর সুন্দর চোখ দুটো উৎসাহে ঝক্‌মক্ করে উঠতো।

জুয়েল অ্যানের শরীরটা প্রকাণ্ড লম্বা হলেও ও কিন্তু আমার কিংবা মা'র চেয়েও অনেক কম খেয়ে দিন কাটাতো। ওর ওজন নেওয়া সম্ভব ছিল না ; তা সম্ভব হলে হয়তো দেখা যেতো ওর আর আমার ওজনে তেমন কোন ফারাক নেই।

ওর বয়স যখন বছর দশেক একবার ওকে 'অ্যালিস-ইন-ওয়াণ্ডার-ল্যাণ্ড' বইটা এনে পড়তে দিয়েছিলাম। বইটার একজায়গায় আছে, কেমন করে বিশেষ একটা বোতলের পানীয় খাওয়ার পরই অ্যালিসের শরীরটা বেলুনের মতো চুপসে গিয়েছিল। বই-এর ঐ জায়গাটা বারবার

আমাকে পড়ে শোনাতে বলতো অ্যান। একদিন ওকে 'গালিভার্স ট্রাভেল্‌স' এনে পড়তে দিয়েছিলাম। লিলিপুট আর দৈত্যদের ঘটনাগুলি তেমন মনে ধরেনি অ্যানের। আরও কিছুদিন পর বই-পড়ার অবস্থাও আর রইলো না। ওর হাতে বইগুলোকে দেখাতো ঠিক ডাকটিকিটের মতন! বাবা ওর জন্য এক ঢাউস টি-ভি কিনে দিয়েছিলেন। টি-ভি'র প্রোগ্রাম দেখতে খুব ভালবাসতো ও। তেরো বছর বয়সের পর থেকেই ঘরের বাইরে আসাটা পুরোপুরি বন্ধ হয়েছিল। ফলে, বাইরের জগতের জীবন সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার রাস্তা হিসেবে ঐ টি-ভি ছাড়া কিছুই ছিল না ওর।

জুয়েল অ্যানের ঘরের পরিসর যতটা সম্ভব বাড়ানো হয়েছিল, তা সত্ত্বেও ওকে সবসময়ই পা-মুড়ে শুয়ে অথবা বসে থাকতে হতো। আমার মাঝে মাঝে মনে হতো—গ্রামের দিকে আমাদের যদি নিদেন পক্ষে একটা খামার-বাড়িও থাকতো—জুয়েল অ্যানকে হয়তো এমন বন্দী হয়ে থাকতে হতো না সেখানে। ঐ রকম একটা খামার-বাড়ি কিনবো বলে একসময় সত্যি সত্যিই আমি টাকা জমাতে শুরু করেছিলাম, এমন কি একটা পার্টটাইম কাজ যোগাড় করা যায় কিনা তা নিয়েও ভাবতাম। কোন্ অঞ্চলে জায়গা-জমি কেনা যায় তা নিয়ে জুয়েল অ্যান আর আমি প্রচুর জল্পনা-কল্পনা করতাম ; ওর মাপ মতো চেয়ার টেবিল বানাতে কত কাঠ লাগবে তার হিসেব-নিকেশ করতাম। অবশ্য যত দিন যাচ্ছিল, জুয়েল অ্যান ক্রমশঃ কথাবার্তা কমিয়ে দিচ্ছিল। তাহলেও আমার সঙ্গ যে ও খুব পছন্দ করতো তা আমি জানতাম। আমি যখন ওর ঘরে গিয়ে ওর নরম তুলতুলে হাতের কাছে বসতাম, ও শুধু নরম দৃষ্টি দিয়ে আমায় দেখতো, ওর ঠোঁটের কোনে হাসি চিক্‌চিক্ করতো তখন। তারপর, যেদিন ওর প্রিয় জিন্‌স্-এর প্যান্টটা কিছুতেই আর শরীরে আঁটলো না—ওর কী মন খারাপটাই না হলো সেদিন! টি-ভি দেখা বন্ধ করলো ; প্রায় কিছু না খেয়েই দিন কাটাতে লাগলো। প্রথম প্রথম আমি আর মা ওকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ-উপরোধ করতাম ; পরে দেখলাম খাওয়া-দাওয়ার ইচ্ছেটাই ওর একেবারে চলে গেছে।

লম্বায় কিন্তু ও তখনও বেড়ে চলছিল। ওর গোটা শরীরটাকে তখন একরাশ তুলোর মতো হাল্কা আর নরম বলে মনে হতো আমার। মা একদিন রান্নাঘরে কাপ-ডিস ধুতে ধুতে আমায় বললো, —ওর শরীরটা কেমন স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, লক্ষ্য করেছিস্? যে

দেয়ালটায় ও হেলান দিয়ে বসেছিল, ওর কাঁধ-গলা'র মধ্যে দিয়ে দিব্যি সেটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম আজ!

আমি বললাম,—আমারও তাই মনে হয়েছে। খেয়াল করলে দেখবে, ওর শরীরের নীচে কার্পেটের কারুকাজগুলো স্পষ্ট দেখা যায়—অনেকটা যেমন বেলুন ফোলানোর পর তার ভেতর দিয়ে আবছা-ভাবে সব কিছু দেখতে পাওয়া যায়—ঠিক তেমনি।

মনে আছে, মার সঙ্গে সেদিন কথাবার্তার পর পা টিপে টিপে অ্যানের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সত্যিই ওর শরীরটাকে একটা স্বচ্ছ বেলুনের মতো দেখাচ্ছিল।

এরও প্রায় মাসখানেক পর একদিন হঠাৎ ও আমায় বললে,—জানো, আমি লম্বায় আর বাড়ছি না।

ওর ঠোঁট দুটো নড়ছিল, হাতের আঙুলগুলো আমার মুখের ওপর বোলাচ্ছিল ও। আমি কিন্তু ওর হাতের কোন চাপ অনুভব করছিলাম না। আমার শুধু মনে হচ্ছিল—খানিকটা উষ্ণ বাতাস বুঝি আমার চোখ-মুখ ছুঁয়ে যাচ্ছে। ওর ঠোঁটের কোণে ভারী মিষ্টি এক টুকরো হাসি দেখেছিলাম সেদিন।

আমার কেন জানি না কান্না পাচ্ছিল। ওর কথার মধ্যে কেমন একটা বিদায়ের সুর বাজছিল। আমার মনের অবস্থাটা সেদিন যেন ও বুঝতে পেরেছিল, ইসারায় আমাকে বসতে বলেছিল ওর কাছে। তারপর ওর সেই ভালবাসার স্পর্শ গায়ে মেখে ঐ ঘরের মধ্যেই সেদিন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই, জুয়েল অ্যানের শরীরটাকে যেন আবছা একটা পর্দার মতো দেখেছিলাম। ওর নাম ধরে বার বার ডেকেও কোন সাড়া পাইনি।

আমার চিৎকার শুনে মা এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল পাশের ঘরে।

সপ্তাহখানেক পর, মা একদিন ছল্-ছল্ চোখে বললো,—ও চলে গেছে।

কথাটা শুনেই আমি ছুটে গিয়েছিলাম জুয়েল অ্যানের ঘরে। ঘরের মেঝেয় ওর পোশাকটা টান্ টান্ হয়ে পড়েছিল। আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল—ও ঘরের মধ্যেই রয়েছে; শরীরটা আরও বড় আর হাল্কা হওয়ায় ওর অস্তিত্ব টের পাচ্ছি না আমরা।

মা জুয়েল অ্যানের ঘরটায় তালা লাগাতে চেয়েছিল—আমি বাধা

দিয়ে নিজের খাটটা টেনে এনেছিলাম ওখানে। সেই থেকে এখনও আমি ঐ ঘরেই আছি। মাঝে মাঝে রাত্রিবেলায় ঘুম ভেঙে গেলে, গায়ে এক অদ্ভুত উষ্ণতার ছোঁয়া এসে লাগে। জুয়েল অ্যান যে আমাদের ছেড়ে কোথাও যায়নি, ও যে সুন্দর চোখ দুটো দিয়ে আমায় দেখছে—আমার গালে-মাথায় হাত বুলোচ্ছে তা দিব্যি টের পাই তখন।

মৃত্যুঘর

মূল কাহিনী :
হারমান ম্যাক্সিমভ

'সিম্-ক্রি' গ্রহের ইতিহাস যারা পড়েছে তারা জানে বহু বছর আগে ঐ গ্রহে আশ্চর্য এক মৃত্যুঘর বানানো হয়েছিল। ওখানকার ইতিহাসের ৭৬নং অধ্যায়ের ৪৯১নং পরিচ্ছেদে 'মৃত্যুঘর' প্রসঙ্গে যে কথা কটি লেখা আছে তা অনেকটা এইরকম : ......শাসনকর্তা 'লাক্-ইফার-শি'র আদেশে এক মৃত্যুঘর তৈরি করা হয়। অদ্ভুত চেহারার সেই বিরাট বাড়িটা টিঁকে ছিল ঐ গ্রহের হিসেবে প্রায় ১৫ বছর। প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন মানুষ যদি মনে করতো যে তার আর বেঁচে থাকার দরকার নেই, সে এসে দাঁড়াতো মৃত্যুঘরের দরজার সামনে। তারপর, কেউ তাকে আর কোনদিন দেখতে পেতো না ; স্রেফ যেন উবে যেতো সে।

'ভেল্ট' নামে এক বিখ্যাত মেকানিক ঐ মৃত্যুঘরের স্রষ্টা। আশ্চর্যের কথা—লোকটা নিজেই আবার তা ধ্বংস করেছিল!

—এটাই তাহলে তোমার চরম সিদ্ধান্ত?

বড় বড় হরফে লেখা কথাটা ফুটে আছে দরজার গায়ে। একসময় হরফগুলো লেখা হয়েছিল হলদে রঙে ; এখন অবশ্য তাতে খানিকটা কালচে ভাব এসেছে। এটা যে ধুলো-কালির আস্তরণের জন্য তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। দরজার গায়ে নখের আঁচড় দিয়ে, তাড়া-হুড়োয় লেখা অসংখ্য নাম—সেই তাদের নাম যারা ঐ দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে, আর কখনও বেরিয়ে আসবে না বলে। দরজার পাশে এক কোণে পড়ে রয়েছে স্তূপীকৃত জামাকাপড় আর জিনিসপত্র—ভেতরে ঢোকার সময় দরজার বাইরে যা অবহেলায় ফেলে গেছে লোকে।

—এটাই তাহলে তোমার চরম সিদ্ধান্ত?

এ প্রশ্নের উত্তরের ওপর নির্ভর করছে সবকিছু। ভেল্টের মনে হলো—বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে! কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে ভেল্ট নীচু গলায় বললো,—হ্যাঁ।

স্টীলের দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গিয়ে ভেতরে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দেয়। ভেল্ট দেখলো, সামনে এক বিরাট সুড়ঙ্গের মুখ, ভেতরের ইলেকট্রিক বাল্বের গায়ে মাকড়সার জাল—আধো-অন্ধকারে রহস্যময়। 'ক্ল্যাক্, ক্ল্যাক্, ক্ল্যাক্'—সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে ভেসে আসা ঐ শব্দটুকু ছাড়া চারপাশে জীবনের আর কোন অস্তিত্ব নেই। ক্ষণিকের জন্য ভেল্টের মনে হয়—একছুটে পালিয়ে যায় দরজার বাইরে, সূর্যের আলোয় বেড়ে ওঠা সতেজ ঘাসের বুকে।

কিন্তু সবুজের বুকে ফিরে গেলেও নিজের অতীতকে তো আর এই দরজার পাশে রেখে যাওয়া যাবে না। মায়ের চোখের জল, বাবা আর ভাইদের ঘৃণা, এই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকা মানুষগুলির জীবনের শেষ অভিশাপ—এ সবই তো তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে।

যদিও ওর শরীরের সমস্ত অণু-পরমাণু বলতে চাইছিল 'না', ভেল্ট চীৎকার করে উঠলো,—হ্যাঁ, সবকিছু ভেবেই আমি এখানে এসেছি।

ভেল্টের পেছনে দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। আধো-অন্ধকার প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গিয়ে ভেল্ট ঢুকলো ঠিক সামনের ঘরটায়। ঘরের মধ্যে আলোর জোর অনেক বেশী, ঘরটার আকৃতিও অদ্ভুত ; চারপাশের দেওয়াল, পায়ের তলার মেঝে, মাথার ওপর ছাদ—সবকিছুই আয়নার টুকরো দিয়ে মোড়া। অসংখ্য আয়নায়—অসংখ্য প্রতিচ্ছবি! দেখে কেমন দৃষ্টি-বিভ্রম হয় ; এই মনে হয়—ঘরখানা কী ছোট্ট, পরক্ষণেই সেটা আবার বিশাল হলঘরের চেহারা নেয়।

ভেল্ট জানে—এটা 'স্বীকারোক্তি'র ঘর। ওর চারপাশে নিজের হাজার হাজার প্রতিবিম্ব! ঘরে ঢোকার সময়কার সেই ভয়-ভয় ভাবটা ওর আস্তে আস্তে কেটে যায়। ভেল্ট দেখলো—ঘরের এক কোণে রয়েছে স্বীকারোক্তি আদায়ের সেই যন্ত্রটা। যন্ত্রের সামনে একটা চেয়ার ; ভেল্ট এগিয়ে গিয়ে চেয়ারটায় বসে।

কে তুমি, জীবনের শেষ চৌকাঠ পেরিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছো?

এত মৃদু ও নম্রস্বরে কথাগুলো ভেসে এল যে প্রথমটায় ভেল্ট-ও চমকে ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। নাঃ, চারপাশে শুধু তারই নিঃশব্দ প্রতিচ্ছবি। ভেল্ট চোখ ফিরিয়ে

আনলো মেশিনের দিকে। যন্ত্রটা তার পরিচয় জানতে চাইছে। ভেল্ট-এর স্মৃতিতে ভিড় করে এলো ছোটবেলার সব কথা। পুরনো দিনের সেই গ্রাম—ধুলো-পায়ে, পরনে ছোট্ট হাফপ্যান্ট—'ভেল্ট'-নামের একটা ছোট্ট ছেলে ছুটে যাচ্ছে তার বাড়ির দিকে। তার মা তাকে ডাকছেন, তাকে খুঁজছেন ; ভেল্ট ছুটতে ছুটতে এসে মুখ লুকোলো মায়ের কোলে।

তোমার নাম কী ?—যন্ত্র আবার প্রশ্ন করে।

এক ঝটকায় স্মৃতিগুলিকে মন থেকে ঝেড়ে ফ্যালে ভেল্ট,—আমি ভেল্ট—নিপ-মা-গালিট্‌ ; এই 'সিম-ক্রি' গ্রহের সবচেয়ে সম্মানিত, সবচেয়ে দক্ষ মেকানিক।

—তুমি কবে এবং কোথায় জন্মেছো ?

ভেল্ট গ্রামের নাম এবং জন্মসময় জানালো।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। যন্ত্রটা যেন ভেল্টের উত্তরগুলো সঠিক কিনা তা মনে মনে যাচাই করছিল। একটু পরেই যন্ত্রের ভেতর থেকে কাঁপা কাঁপা খোনা স্বরে গান ভেসে এলো। ঐ তীক্ষ্ণ আওয়াজে প্রথমে ভয়ে চমকে উঠেছিল ভেল্ট। গানের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের পেট থেকে বিকট সব শব্দ হচ্ছিল ! ভেল্টের মনে হলো—কেউ যেন প্রচণ্ড জোরে তার থুতনিতে ঘুঁসি মেরেছে। ভয়ে-আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলো ভেল্ট আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো তার হাজার হাজার প্রতিবিম্ব।

এ কী আশ্চর্য ব্যাপার ! যে লোকটা মরতে চলেছে, যন্ত্রটা তাকে কোথায় সান্ত্বনা দেবে—তা না, উল্টে এরকম পিলে-চমকান গলায় বিচ্ছিরি গান ? ভেল্টের ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। যন্ত্রটার ভেতর থেকে একঘেয়ে সুরে বেরিয়ে আসছে কতকগুলো শব্দ—

এ লোকটার যাবার কোন জায়গা নেই, জায়গা নেই—

আজ তাই এসেছে এখানে—এই মৃত্যুঘরে।...

যন্ত্রটা হঠাৎ গান থামিয়ে ছকে বাঁধা ঢঙে জিজ্ঞাসা করে,—যাদের সঙ্গে তোমার রক্তের সম্পর্ক, এখানে আসার আগে কি বিদায় নিয়ে এসেছো তাদের কাছ থেকে ?

ভেল্টের কাছে প্রশ্নটা অবান্তর বলে মনে হলো। বিরক্ত হলো ও।

তুমি কি তোমার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছো ?—আবার সেই যান্ত্রিক প্রশ্ন।

—আমার কোন নিকট-আত্মীয় নেই। গালিট্‌-বংশের আমিই শেষ মানুষ।

—তোমার বন্ধুদের বলেছো ?

—সিম-ক্রি গ্রহে সৎ মানুষের সংখ্যা এখন বড়ই কম।...আমার কোন বন্ধু নেই।

তাহলে, তুমি যে এখানে এসেছিলে—সে খবরটা আমি কাকে জানাবো ?—যন্ত্রের গলায় বিস্ময়।

ভেল্ট একটু চুপ করে থেকে বললো,—আমার শেষ খবরটা আমাদের শাসনকর্তাকে জানিও। শুনে উনি খুশি হবেন।

হ্যাঁ, শাসনকর্তা অবশ্যই খুশি হবেন। অন্ততঃ ভেল্ট তাঁকে যেসব অপমানকর চিঠিপত্র লিখেছে তা মনে রেখে ওর মৃত্যু-সংবাদে লোকটাকে খুশি হতেই হবে। বড়জোর হয়তো লোক দেখানোর জন্য বলবেন—আহা, আমাদের সবচেয়ে সেরা মেকানিক, সে কিনা আত্ম-হত্যা করলো !

—সারা জীবনে তুমি কি কোন ভাল কাজ করেছো ?

যন্ত্রের স্বর এখন আগের তুলনায় অনেক বেশী অন্তরঙ্গ, নরম। ভেল্ট তার সারা জীবনে কি কখনও কোন ভাল কাজ করেনি ? নিশ্চয়ই করেছে। আসলে, যে কোন লোকের পক্ষেই একটাও ভাল কাজ না করে গোটা জীবনটা কাটানো মুশকিল। ভেল্ট চোখ বুজে তার ভাল কাজগুলোকে মনে করার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে। ভেল্ট এমন জিনিস বানিয়েছিল যার সাহায্যে খনি থেকে খুব সহজেই ধাতু নিষ্কাষণ করা সম্ভব। এটা নিশ্চয়ই খুব ভাল কাজ। তা না হলে, তার গ্রহবাসীরা তাদের চৌরাস্তার মোড়ে তার মূর্তি বসাতো কি ? তাছাড়া ভেল্ট তরঙ্গতত্ত্বের সূত্রও আবিষ্কার করেছিল। তবে তার আবিষ্কার—তার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সেরাটি হলো...

—আমি যে জীবনে ভাল কাজ কিছু করেছি—তার প্রমাণ তো তুমি নিজেই। আমিই তো তোমাকে সৃষ্টি করেছি।

আমাকে ?—যন্ত্রের কণ্ঠে বিস্ময়।

—হ্যাঁ। শুধু তোমাকেই নয়—আমি তৈরি করেছি এ বাড়ির যাবতীয় জিনিস ; আসলে আমিই তো এই মৃত্যুঘরের স্থপতি।

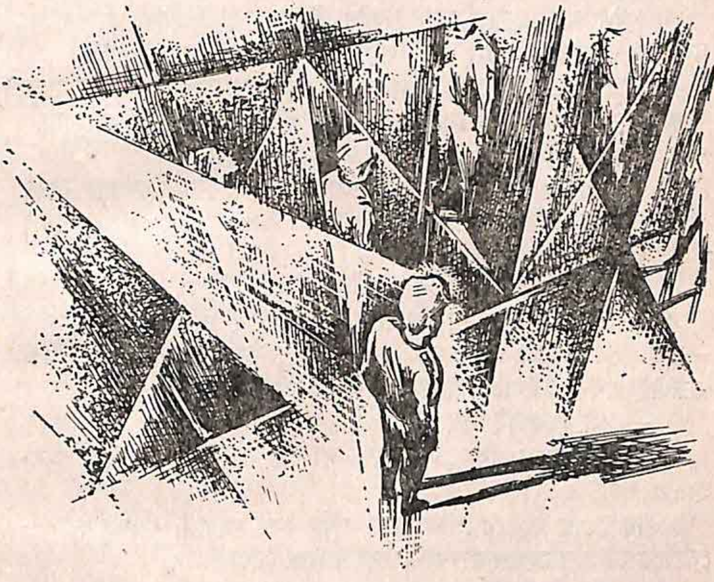
তুমি সত্যি কথা বলছো তো ?

—মৃত্যুর আগে শেষ স্বীকারোক্তির সময় কেউ কি মিথ্যে কথা বলে ?

—বেশ, তুমি নিজেই যদি এই মৃত্যুঘর বানিয়ে থাকো তবে নিশ্চয়ই জানো—এরপর তোমার কী হবে ?

জানি।—ভেল্ট দৃঢ়গলায় জবাব দিলো ঃ আমার স্বীকারোক্তির

পালা শেষ হলেই সামনের ঐ দরজাটা খুলে যাবে। দরজার ওপারে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। যদ্দুর মনে পড়ছে—বিয়াল্লিশটা ধাপ আছে ঐ সিঁড়িতে। ঐ সিঁড়ি দিয়ে যখন নামবো, তখন কোন একটা ধাপে পা রাখামাত্র ইলেকট্রিকের প্রচণ্ড শক্ খেয়ে গড়িয়ে পড়বো আমি। কোন্ ধাপে যে তুমি ইলেকট্রিক কারেন্ট পাঠাবে তা অবশ্য আমি জানি না। একেক জনের ক্ষেত্রে সেটা একেক রকম। ইলেকট্রিক শক্ খাবার পরও আমি পুরোপুরি মরতে নাও পারি ; সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আমার শরীরটা গিয়ে পড়বে একটা চৌবাচ্চায়। ঐ চৌবাচ্চায় রাখা আছে এক বিশেষ রাসায়নিক দ্রবণ—যার সাংকেতিক



নাম 'কিউ'। ঐ রাসায়নিক দ্রবণের সংস্পর্শে আসার মাত্র সাত সেকেণ্ডের মধ্যে আমার শরীরের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না!

উঁহু, তোমার জামার প্ল্যাস্টিকের বোতামগুলো থেকে যাবে। —যন্ত্রের স্বরে ক্ষোভের সুর স্পষ্ট ঃ আসলে, 'কিউ' দ্রবণে প্ল্যাস্টিক গলে না। সেজন্যেই আমাকে এরই মধ্যে অন্ততঃ তিনবার ড্রেন-পাইপ সাফ করতে হয়েছে।

ভেল্টের ইচ্ছে হলো—হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে। 'তাহলে,

ব্যাটা যন্ত্র—প্ল্যাস্টিকের বোতামগুলো নিয়ে তুমি তো সত্যিই বড় ফ্যাসাদে পড়েছ!' ভেল্ট বুঝতে পারছিল, হাসির তুফান তার বুক থেকে গলা, গলা থেকে ঠোঁটে উঠে আসছে। হ্যাঁ, বুড়ি ঠাকুমারা যেমন তাদের নাতিরা ক্রমাগত প্যান্ট নোংরা করলে অথবা রান্নাঘর থেকে খাবার চুরি করে খেলে—ঘ্যানর ঘ্যানর করে এর-ওর কাছে নালিশ করে বেড়ায়, যন্ত্রটা ঠিক তেমনিভাবে ওর ড্রেন-পাইপের অসুবিধের জন্য অনুযোগ করছে। আহা, এই যে প্রতিদিন শয়ে শয়ে লোক এসে মৃত্যুঘরে ঢুকছে—তাতে যন্ত্রটার কোন আপত্তি নেই...শুধু যদি তাদের জামার বোতামগুলো প্ল্যাস্টিকের বদলে অন্য কিছু দিয়ে তৈরি হতো!

তুমি হাসছো?—যন্ত্রটা বলে উঠলো ঃ এখানে আসার পর অনেকেই অবশ্য নার্ভাস হয়ে পড়ার দরুণ এরকমভাবে হাসে।

ভেল্টের গোটা শরীর হাসিতে আবার কেঁপে ওঠে। যন্ত্র চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করে,—এবারে বলো, সারা জীবনে তুমি কী কী খারাপ কাজ করেছো?

যন্ত্রের গমগমে আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই ভেল্ট বললো,—হ্যাঁ, আমি খারাপ কাজও করেছি।

—কী সেটা?

—আমি তোমাকে তৈরি করেছি।

তোমার কথা কেমন এলোমেলো, কিছুই বুঝতে পারছি না। —যন্ত্র বলে ওঠে ঃ এই তো একটু আগেই বললে—আমাকে সৃষ্টি করাটাই নাকি তোমার জীবনের সবচেয়ে ভাল কাজ?

—ভাল কাজটাই কখনো কখনো খারাপ হয়ে যায়...।

আমি, সত্যি, কিছুই বুঝতে পারছি না।—যন্ত্রের স্বরে অসহায়তা ফুটে ওঠে।

কি করে বুঝবে? আসলে, তুমি তো শুধুই একটা যন্ত্র।—ভেল্টের ঠোঁটের কোণে হাল্কা হাসির ছোঁয়া লাগে।

—কিন্তু আমি যে তোমার কথাগুলো বুঝতে চাই। ভাল কাজটা কেন খারাপ হয়ে গেল? আচ্ছা, তুমি তখন কেন বললে, আমাকে সৃষ্টি করে তুমি জীবনের সবচেয়ে ভাল কাজ করেছো?

—আমার ধারণা হয়েছিল—আমি এমন কিছু একটা সৃষ্টি করছি যা আমাদের গ্রহের সমস্ত মানুষকে সাহায্য করবে—

ভেল্টের কথা শেষ হবার আগেই যন্ত্র বলে উঠলো,—সাহায্য করবে? মরে যেতে সাহায্য করবে?

—না। আমি ভেবেছিলাম—এই মৃত্যুঘর ওদের বেঁচে থাকার ব্যাপারেই সাহায্য করবে।

—বুঝতে পারলাম না।

হ্যাঁ, সত্যিই তো—একটা যন্ত্র এটা বুঝবে কি করে? আসলে একটা মানুষ তো তখনই স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে যখন মৃত্যুটা থাকে তার নিজের হাতের মুঠোয়। যখন কারো বেঁচে থাকার আর কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন যদি বিনাকষ্টে মারা যাওয়ার কোন সহজ উপায় তার হাতের কাছে থাকে—তবে তার চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে? ভেল্টের মনে পড়লো, তাদের গ্রহের প্রধান শাসনকর্তা লাক্-ইফার এইসব কথাগুলোই বলেছিলেন তাকে। যারা বৃদ্ধ—চোখে দেখে না, কানে শোনে না, বেঁচে থাকার কোন আগ্রহই যাদের নেই, অথচ আত্মহত্যা করতে ভয় পায়—তাদের কাছে মৃত্যুঘর তো আশীর্বাদের মতো। লাক্-ইফার বলেছিলেন,—আমি যখন বুড়ো হবো, 'সিম-ক্রি' গ্রহের শাসনভার যখন আর বইতে পারবো না—তখন আমিও নির্দ্বিধায় গিয়ে দাঁড়াতে পারবো মৃত্যুঘরের দরজায়।

লাক্-ইফার একটু থেমে আবার শুরু করেছিলেন ঃ যে মানুষের বেঁচে থাকার কোন আগ্রহ নেই তাকে বাঁচিয়ে রাখা শুধু অর্থহীনই নয়, উল্টে সে তো সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। যাদের কাছে নিজেদের জীবনেরই কোন মূল্য নেই তারা সমাজের আর পাঁচজন মানুষেরও বেঁচে থাকার মধ্যে কোন অর্থ খুঁজে পায় না।...আসলে যারা মরতে চায় তাদের ইচ্ছাপূরণ করাটাই তো আমাদের উচিৎ।...

ভেল্টের মনে পড়ে, শাসনকর্তার ঐসব কথা তখন অনেকেই মেনে নেয়নি। তারা বলেছিল ঃ

এসব কথা মিথ্যে।

এসব অন্যায়, অপরাধ।

এসব চিন্তা পাপ।

কথাগুলোর মধ্যে সত্যতা কিছু থাকলেও জোরগলায় তা বলতে পারেনি কেউ। আসলে, শাসনকর্তার বিরুদ্ধে চীৎকার করে কিছু বলার সাহস কারোর ছিল না। ভেল্টের কানে এসব অভিযোগ অবশ্য পেঁছোয়নি ; ও আপন মনে ওর কাজ করে গেছে। মৃত্যুঘরের উপযুক্ত জায়গা হিসেবে একটা বিশেষ উপত্যকাকে বেছে নিয়েছিল ভেল্ট। জায়গাটার চারপাশে উঁচু-উঁচু পাহাড়। সবশুদ্ধ একুশটা আলাদা আলাদা টানেল তৈরি করেছিল ভেল্ট—যার প্রত্যেকটার ভেতর দিয়ে মৃত্যুঘরের মূল ফটকের সামনে পেঁছোনো যায়। মৃত্যুঘরের

দিকে যাবার সময় যাতে একজনের সঙ্গে অন্যজনের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে সেই উদ্দেশ্যেই ঐ ব্যবস্থা। মনস্তাত্ত্বিকদের সঙ্গে আলোচনা করে মৃত্যুঘরের মধ্যে এমন কিছু ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল যা জীবনের শেষ সময়টুকুতে মৃত্যুপথযাত্রীদের শান্তির ছোঁয়া দেয়, সহানুভূতির সঙ্গে তাদের অন্তিম ইচ্ছাপূরণের লক্ষ্যে যাতে এগিয়ে নিয়ে যায়।

—তুমি বলতে চাও—মৃত্যুঘর তৈরি করে তুমি এ গ্রহের মানুষদের জীবনকে সহজতর করেছিলে ?

আবার প্রশ্ন! প্রথমটায় চমকে উঠেছিল ভেল্ট ; স্মৃতিচারণা করতে করতে যন্ত্রটার অস্তিত্বও প্রায় ভুলেই গিয়েছিল।

—না। যা ভেবেছিলাম—সবকিছুই ঠিক তার উল্টো হয়ে গেল!

হ্যাঁ, যে প্রত্যাশা নিয়ে ভেল্ট মৃত্যুঘর বানিয়েছিল—সেগুলি কেমন যেন সব ওলট্‌পালট হয়ে গেল। ওর সেই মৃত্যুঘর আত্ম-হত্যার ব্যাপারটাকে আইনের আশ্রয় তো দিলোই। সেই সঙ্গে মানুষকে আত্মহত্যা করতে উৎসাহিত করলো। হতাশাগ্রস্থ মানুষরা সব দলে দলে আসতে লাগলো মৃত্যুঘরের দরজায়। জীবনে অনেক পোড়-খাওয়া মানুষরা যেমন আসতো তাদের সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়োতে—তেমনি মুহূর্তের উত্তেজনাও বহু মানুষকে টেনে আনতো ঐ মৃত্যুপুরীতে। ক্রমে মৃত্যুঘরে ঢুকে আত্মহত্যা করাটা যেন এক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ালো!

ভেল্টের যাবতীয় খাটুনি বিফলে গেল। মৃত্যুঘর তার এক অপকীর্তির প্রতীক হয়ে রইলো। ভেল্টের মনে পড়ে—হাজার হাজার চিঠি আসতো প্রতিদিন। প্রত্যেকটা চিঠির মধ্যে দিয়ে মানুষের অভি-শাপ এসে পৌঁছোতো তার কাছে। ভেল্ট চারপাশে অবিরাম ফিস্‌-ফিস্‌ শব্দ শুনতে পেতো। কখনও কখনও তার মনে হতো, কেউ বুঝি তার পাশে গুমরে গুমরে কাঁদছে—কান্নার মধ্যে দিয়ে বলতে চাইছে,—তুমি অপরাধী। মৃত্যুঘর বানিয়ে তুমি মহাপাপ করেছো।

ভেল্টের একসময় মনে হয়েছিল—ও পাগল হয়ে যাবে। আর সেই ভয়েই পালিয়েছিল ওর পরিচিত লোকজনের কাছ থেকে অনেক দূরে—গ্রহের একেবারে অন্যপ্রান্তে। সেখানে অচেনা লোকের মাঝে ভিন্ন পরিচয়ে বহু বছর কাটানোর পর ভেল্টের মনে হয়েছিল—এইবার বোধহয় ও নিজের জায়গায় ফিরতে পারে। নিশ্চয়ই এতদিনে সবাই ওর কথা ভুলে গেছে।

ভেল্টের দুর্ভাগ্য—কেউ ওকে ভোলেনি। বহুদিন বাদে ওকে

দেখতে পেয়ে প্রথম যে বুড়িটা ছুটে এসেছিল তার কথাগুলো স্পষ্ট মনে পড়ে।

—শ্রদ্ধেয় ভেল্ট, আপনি বলুন—সত্যিই কি আপনার ঐ মৃত্যু-ঘরের মধ্যে ঢুকলে কারোর আর কোনরকম ভয়ডর থাকে না?

তার মানে?—ভেল্ট প্রশ্নটা ঠিক ধরতে পারেনি।

আমার নাতি—একেবারে বাচ্চা। বিশ্বাস করুন, ওর বয়স আঠারো বছরও পেরোয়নি। সেও কেমন নির্ভয়ে মৃত্যুঘরে...

ভেল্ট আর দাঁড়াতে পারেনি, ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল ওখান থেকে।

সন্ধ্যেবেলায় দেখা হয়েছিল পুরনো বন্ধু উরাম-কারাখের সঙ্গে। ওর কাছেই ভেল্ট সেই ট্যাবলেটের কথা প্রথম জানতে পারে। উরাম ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেছিল, 'ট্যাবলেটগুলো আসলে এত ছোট যে দেখলে তোমার বার্লির দানা বলে ভুল হবে। ওর একটা খেলেই যে কারোর মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবণতা জাগে! অনেকে আবার বলছে—আমাদের শাসনকর্তা লাক্‌-ইফারের কারসাজিতেই নাকি এই 'বিষ' বাজারে অঢেল মিলছে। কে বলতে পারে—যেসব লোকেরা আমাদের শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়—তাদের ধরে ধরে ওগুলো খাওয়ানো হচ্ছে না?

*　　　*　　　*

পুরনো কথাগুলোই ভাবছিল ভেল্ট। ভাবনাগুলো ধাক্কা খেলো যন্ত্রের কথায়।

—আর কিছু বলার থাকলে বলতে পারো। স্বীকারোক্তির জন্য আরও চারমিনিট সময় তুমি পাবে।

কী লাভ?—ভেল্ট নিরাসক্ত গলায় বললো।

—তার মানে—তুমি তো দেখছি মৃত্যুর জন্য উতলা হয়ে উঠেছো?

উঁহু। আমি আসলে তোমাকে ধ্বংস করার জনাই উদ্‌গ্রীব—। —ভেল্ট কথাগুলো যেন ছুঁড়ে মারলো।

—আমাকে ধ্বংস করবে? সে ক্ষমতা তোমার নেই।

—ভুলে যেও না—আমিই তোমার সৃষ্টিকর্তা!

—কিন্তু তোমার কাছে তো কোন অস্ত্র নেই।

—আমি নিজেই নিজের অস্ত্র!

ভেল্টের চোখেমুখে এখন উৎসাহ ঝিলিক দিচ্ছে। হ্যাঁ, ভেল্ট

তো জানতোই—মৃত্যুঘর কোন মানুষকেই অস্ত্র নিয়ে ঢুকতে দেয় না। আসলে, ভেল্টই তো এমন কায়দা করেছিল যাতে বাইরে থেকে কেউ একে ধ্বংস করতে না পারে।

—এখানে ঢোকার আগে আমি দুটো 'সিটেন' ট্যাবলেট খেয়ে নিয়েছি।

—সেটা আবার কী?

একটা রাসায়নিক পদার্থ। ভেল্ট জবাব দেয়। একটু পরেই সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ইলিকট্রিক শক্ খেয়ে যেই আমি ছিট্‌কে পড়বো চৌবাচ্চায় রাখা 'কিউ'-এর দ্রবণের মধ্যে—সংগে সংগে তার সাথে 'সিটেনে'র যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে তার ফলেই একটা জোরালো বিস্ফোরণ হবে এবং...

অ্যাঁ, বিস্ফোরণ? না, তা আমি হতে দেবো না। আমি তোমাকে সিঁড়ির কাছে যেতেই দেবো না।—যন্ত্রের কণ্ঠে অগাধ প্রত্যয়।

না, তা তুমি করতে পারো না। যে মানুষ একবার মৃত্যুঘরের চৌকাঠ পেরিয়েছে, সিঁড়ির কাছে সে যাবেই। তাকে আটকানোর সাধ্য কোন যন্ত্রের নেই।

থেমে থেমে জোর দিয়ে কথাগুলো বলে ভেল্ট এগিয়ে গেল ঘরের একটা বিশেষ দেওয়ালের দিকে।

আমি ভেল্ট—এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

দেওয়ালজোড়া আয়নার কিছুটা অংশ সরে গিয়ে ভেতরে যাবার একটু সরু রাস্তা বেরিয়ে পড়লো ভেল্টের চোখের সামনে।

একটুখানি দাঁড়াও!

ভেল্ট দেখলো মৃত্যুঘরের যন্ত্রটা বাঁচার জন্য কেমন আকুল হয়ে উঠেছে।

—দাঁড়াও। মৃত্যুঘরকে এভাবে ধ্বংস করো না। আমি তোমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—তোমাকে সে ক্ষমতা আদৌ দেওয়া হয়নি। আর কেউ না হোক, আমি তো এটা জানি।

তুমি ঠিকই বলেছো।—যন্ত্রের গলায় বিষণ্ণতার ছোঁয়া ঃ বেশ, তবে বিদায় জানাচ্ছি তোমাকে। সামনের দরজা দিয়ে এগোলেই সিঁড়ির ধাপ শুরু।

বিদায়।—ভেল্ট যন্ত্রের দিকে শেষবারের মতো ফিরলো। তারপর সিঁড়ির দিকে এগোনোর আগে নিজের হাজার হাজার প্রতিবিম্বের কাছ থেকেও বিদায় নিলো হাত নেড়ে।

আজব ডিম

বিল ব্রাউন

পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে। একটা প্লেন-অ্যাক্সিডেন্ট হলো, অথচ লোকজনের কোন ভিড় নেই, আসার পথে রাস্তায় একটা অ্যাম্বুলেন্স-ও চোখে পড়লো না! অ্যালসপের পুরনো খামারবাড়ির নড়বড়ে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে র‍্যাফার্টি ভাবলো—দূর ছাই, ফিরেই যাই। ঐ উড়ো টেলিফোনের খবরটা বিশ্বাস করাটা উচিৎ হয়নি—।

অ্যালসপ্-কর্তা বেরিয়ে আসতেই র‍্যাফার্টি নিজের পরিচয় দিলো,—আমার নাম ওয়ার্ড র‍্যাফার্টি ; 'দ্য টাইম্স্' কাগজ থেকে আসছি।

কথাটা শেষ করেই র‍্যাফার্টি একবার আড়চোখে বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে নেবার লোভ সামলাতে পারে না। আসলে, দ্য টাইম্স্-এর সবচেয়ে নামজাদা রিপোর্টারকে চাক্ষুষ দেখার পর লোকজনের মুখে যে ভ্যাবাচাকা ভাবটা ফুটে ওঠে সেটা দেখে ওর দারুণ তৃপ্তি হয়।

র‍্যাফার্টি!—ভদ্রলোক যে 'দ্য টাইম্সে'র পাঠক নন তা তাঁর ভ্রূ-কুঁচকে তাকানোর ভঙ্গী দেখেই বোঝা যায়।

আমি খবরের কাগজের রিপোর্টার।—র‍্যাফার্টি বোঝানোর চেষ্টা করে ঃ খানিকক্ষণ আগে একজন টেলিফোনে বললো—আপনার খামার-বাড়িতে নাকি একটা অ্যারোপ্লেন ভেঙে পড়েছে। সেই শুনেই তো দৌড়ে আসা—।

অ্যারোপ্লেন? কই নাতো।—অ্যালসপের চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ।

দরজার পর্দা সরিয়ে অ্যালসপ্-গিন্নী বেরিয়ে আসেন। পুরো ঘটনাটা পুনরাবৃত্তি করে র‍্যাফার্টি কিন্তু গিন্নীরও সেই একই উত্তর।

মনে হয় স্রেফ উড়ো খবর।—র‍্যাফার্টি ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ায় ঃ অবশ্য রোজই তো এরকম কত খবর আসে কাগজের অফিসে। তবে কিনা, লোকটার বর্ণনা দিল নিখুঁৎ। ও নাকি দেখেছে—একটা

জ্বলন্ত অ্যারোপ্লেন গোঁত্তা খেয়ে একেবারে সোজা এসে নামলো আপনাদের বাড়ির লাগোয়া জমিতে।

দাঁড়ান, দাঁড়ান।—অ্যালসপ্-গিন্নীকে চিন্তিত দেখায় ঃ হ্যাঁ, আজ সকালে ওটা আমাদের বাগানে এসে নেমেছে বটে, কিন্তু ভেঙে পড়েনি তো। তাছাড়া ওকে অ্যারোপ্লেনই বা বলছেন কেন? অ্যারোপ্লেনের মতো ওটার তো কোন ডানা নেই।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় র‍্যাফার্টি,—ডানা নেই? তবে কি আজ সকালে কোন হেলিকপ্টার নেমেছিল আপনাদের এখানে?

উঁহু।—অ্যালসপ্-গিন্নী মাথা নাড়েন হেলিকপ্টারের তো মাথার ওপর পাখা থাকে।

—তাহলে?

—আমাদের বাড়ির পেছনের বাগানেই তো এখনো রয়েছে ওটা। অ্যালফ্রেড, ভদ্রলোককে বরং ওখানেই নিয়ে যাও। যান গিয়ে দেখে আসুন। তবে হ্যাঁ, বৃষ্টিতে বড় কাদা হয়ে আছে, একটু সাবধানে হাঁটবেন।

আসুন, আমার সঙ্গে।

অ্যালসপ্-কর্তার পেছন পেছন হাঁটতে থাকে র‍্যাফার্টি।

বুঝলেন, এবার আমার কপালটা ভালো ঃ মুরগীর ছানা হয়েছে অঢেল।—অ্যালসপ্‌কে পুলকিত দেখায়। তবে হ্যাঁ, এ অঞ্চলে আমার খামারের মুরগীর সুনাম আছে মশাই। মিনোরকাস মুরগীর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? আচ্ছা আপনার কি মনে হয়—আমার এই মুরগীগুলো অন্যগ্রহে গিয়ে এখানকার মতো ডিম দেবে না?

—কোথায় বললেন?

অন্য কোন গ্রহে।—স্বাভাবিক গলায় উত্তর দেন অ্যালসপ্। তারপর র‍্যাফার্টি আর কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই কাঠের ছোট দরজা ঠেলে বাগানের বেড়ার ভেতর ঢুকে যান তিনি। অ্যালসপের পেছন পেছন বাগানের ভেতর ঢুকে সামনে চাইতেই র‍্যাফার্টি বোঝে—তার অ্যাদ্দুর ছুটে আসা একেবারে ব্যর্থ হয়নি।

এদিক ওদিক খড়ের টুকরো ছড়িয়ে থাকা ঘাসজমিটার ওপর যে অতিকায় বস্তুটি পড়ে রয়েছে—পয়লা নজরে সেটাকে আধ-ফোলানো প্লাস্টিকের বেলুন বলেই মনে হলো র‍্যাফার্টির। নিশ্চয়ই এ অঞ্চলের কোন ক্ষ্যাপাটে লোকের কীর্তি। বেলুনে চেপে চাঁদে

যাওয়ার মতলব করেছিল বোধহয়। বোকাসোকা কোন লোক হয়তো এই চুপ্‌সে-যাওয়া বেলুনটাকে উড়োজাহাজ বলে ভুল করে কাগজের অফিসে খবর দিয়েছিল। কথাটা ভেবেই মুচ্‌কি হাসি ফুটে উঠলো র‍্যাফার্টির ঠোঁটে।

—এটা নিশ্চয়ই আপনি বানান নি, কী বলেন মিস্টার অ্যালসপ্‌?

না, না, কী যে বলেন!—হেসে ওঠেন অ্যালসপ্‌-কর্তা ঃ নিজে বানানো তো দূরের কথা, এটা যে কি করে বানায়—সে সম্পর্কেই আমার কোন ধারণা নেই মশাই। আসলে, ওটাতে চেপে আমাদের বন্ধুরা আজ এসেছে।

নাঃ, লোকটার মুখচোখ দেখে তো মনে হয় না—মিথ্যে কথা বলছে। একটু যেন অস্বস্তি বোধ করে র‍্যাফার্টি।

—আপনার এই বন্ধুরা কারা মিস্টার অ্যালসপ্‌?

ভাববেন হয়তো ঠাট্টা করছি।—আমতা আমতা করে উত্তর দেন অ্যালসপ্‌ ঃ ওরা যে কারা তা আমি নিজেও ঠিক জানি না। আসলে ওরা ভালভাবে কথা বলতে পারে না, মানে কোনও কথাই বলে না আর কি! তবে ওদের সঙ্গে মেশার পর যেটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয়—ওদের নাম খুব সম্ভবতঃ হাতুড়ি দিয়ে লোহা-পেটাইওয়ালা।

অ্যাঁ!!—চমকে অ্যালসপের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চুপ্‌সে যাওয়া বেলুনটার দিকে এগিয়ে যেতেই কিসে যেন ধাক্কা খেয়ে 'ওফ্‌' বলে চেঁচিয়ে ওঠে র‍্যাফার্টি।

ওহো ঃ আপনাকে বলতে ভুলে গেছি—ওদের ঐ বেলুন-যানের চারপাশে কী যেন এক অদৃশ্য জিনিসের ঘেরাটোপ দেওয়া থাকে!—র‍্যাফার্টিকে বোঝানোর চেষ্টা করে অ্যালসপ্‌ ঃ আসলে গ্রামের ছেলে-পুলেগুলো যা বাঁদর! ওরা যাতে গাড়িটাকে ভেঙেগেটেঙে না ফেলে তার জন্যই ওদের এই ব্যবস্থা।

আপনার ঐ বন্ধুরা এখন কোথায়—বলতে পারেন? কপালের ফুলে যাওয়া অংশটায় হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞাসা করে র‍্যাফার্টি।

—আরে, সেটা তো আগে বললেই হতো। ওরা তো আমাদের বাড়িতেই বসে আছে। তবে হ্যাঁ, আবার বলছি—ওদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো কিন্তু একেবারেই দুষ্কর।

নাহয় একবার চোখের দেখাই দেখে যাই।—র‍্যাফার্টি পেছন ফেরে।

বুঝলেন, আমাদের ঐ বন্ধুরা প্রথম এখানে এসেছিল বছর ছয়েক আগে।—বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে কথা শুরু করেন অ্যালসপ্ ঃ বলতে পারেন, সেও আমার মুরগীর টানে। কটা ডিম চাইতে এসেছিল। ওদের দেশে নিয়ে গিয়ে পোলট্রি বানাবে। তা, আমার কাছে এসে অবশ্য ঠিকই করেছিল। হাঁস-মুরগীর ব্যাপারটা এ অঞ্চলে আমার চেয়ে আর ভাল কে বোঝে বলুন?

—তারপর?

—ডিম তো দিলাম। কিন্তু যেতে যেতেই সব নষ্ট হয়ে গেল। যাবেই তো। রাস্তা তো আর কম নয়—যেতেই নাকি তিন বছর সময় লাগে! তা শেষ পর্যন্ত ঐ ডিমের জন্যই আবার ফিরে এসেছে। এসেছে এবার আর চিন্তা নেই; আমি ওদের একটা ছোট্ট তা-দেবার যন্ত্র দিয়ে দিয়েছি। পথে যেতে যেতেই ডিম ফুটে দিব্যি মুরগী বেরিয়ে আসবে। বুদ্ধিটা মন্দ নয়, কি বলেন?

তা তো বটেই।—কোনরকমে জবাব দেয় র্যাফার্টি। তার তখন বিস্ময়ে-উত্তেজনায় দম আটকানো অবস্থা।

একটা কথা বলে নিই,—সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মন্তব্য করেন অ্যালসপ্ ঃ আমাদের ঐ ভিন্‌গ্রহের বন্ধুদের সম্পর্কে আরও কিছু জানতে হলে আমার গিন্নীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নেই। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা সব উনিই চালান কিনা। তাছাড়া ওদের মধ্যেকার মহিলাটির সঙ্গে আমার গিন্নীর বেশ ভাবসাবও হয়েছে বলে মনে হয়।

বসার ঘরের দরজাটা ফাঁক করতেই অ্যালসপ্-গিন্নী এগিয়ে এলেন। ভেতরে তাকাতেই র্যাফার্টি দেখলো—উল্টো দিকের সোফায় বসে আছেন অ্যালসপ্ পরিবারের 'সেই দুই বন্ধু'। দুজনেরই স্বচ্ছ গোলাপী মুখ—অভিব্যক্তির কোনরকম ছাপ নেই তাতে! চোখ দুটো গোল গোল; দেখলে মনে হয়—কেউ যেন রঙ্ দিয়ে মুখের দুপাশে এঁকে দিয়েছে। দুজনেরই মাথার ওপর লিক্‌লিকে শুঁড়; পুরুষ-নারীর তফাৎ বোঝার কোন উপায় নেই।

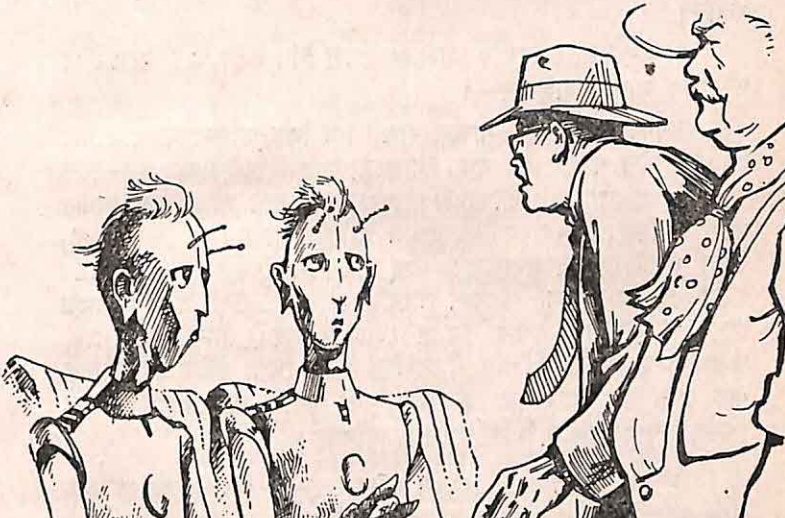
হ্যাঁ, এই হলো মিস্টার র্যাফার্টি, খবরের কাগজের রিপোর্টার—এর কথাই বলছিলাম।—বন্ধুদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলেন অ্যালসপ্-গিন্নী। অমনি তাঁদের মাথার শুঁড়গুলো কেমন এদিক-ওদিক নড়তে লাগলো।

ইয়ে, মানে, আমি কি ওঁদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি?—বেশ নার্ভাস বোধ করে র্যাফার্টি।

স্বচ্ছন্দে। ও'রাও কথা বলতে ভালবাসে।—উৎসাহের সঙ্গেই বলে ওঠেন অ্যালসপ্-গিন্নী।

—ওদের নাম যেন কী—মিসেস অ্যালসপ্?

না, মানে, আমরাও ঠিক জানি না।—একটু আমতা আমতা করেই উত্তর দেন গৃহকর্ত্রী ঃ ও'দের কথাবার্তা আসলে অনেকটা ছবির মতো। যেমন আপনি ও'দের দিকে তাকিয়ে কোন প্রশ্ন করলেন, ওরা তার উত্তরে কিছু একটা চিন্তা করবে এবং সংগে সংগে আপনার মনের মধ্যে ফুটে উঠবে কতকগুলি ছবি—মানে, ব্যাপারটা যে বেশ



জটিল তাতো বুঝতেই পারছেন। তা, ওদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই যে ছবিটা ওরা দেখিয়েছে—তাতে একজন লোক লোহার পাতের ওপর হাতুরির ঘা দিচ্ছে। ভারতের কোন কোন জায়গার মতো ওদের ওখানেও হয়তো যার যার পেশা অনুযায়ী নামকরণ করা যায়।

শুঁড়-ওয়ালা লোক দুটোর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে র‍্যাফার্টি বলে,—আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়—ওরা আমার সঙ্গে কথা বলবে?

নিশ্চয়ই।— অ্যালসপ্-গিন্নী বলেন ঃ যে কোন প্রশ্ন করার পর এইভাবে মাথার ওপর আঙুল-তুলুন। আপনি যে উত্তর চাইছেন— সেটা তখন ওরা বুঝে নিয়ে আপনার মাথায় চিন্তার ঢেউ পাঠাবে।

অ্যালসপ্-গিন্নীর দেখাদেখি মাথার ওপর আঙুল তুলে ধরে র‍্যাফার্টির নিজেকে একটা আস্ত উজবুক বলে মনে হচ্ছিল। তবু সেই অবস্থায় অ্যালসপ্-গিন্নীর দিকে তাকিয়ে বললো,—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করুন তো, ওরা কোত্থেকে আসছে।

এ প্রশ্নটা অবশ্য আগেও ওদের করেছি—।—অ্যালসপ্-গিন্নী মুচকি হাসলেন ঃ আপনার খাতিরে নাহয় আর একবার জিজ্ঞাসা করছি।

—আপনারা কোত্থেকে আসছেন সেটা ইনি মানে, এই রিপোর্টার ভদ্রলোক জানতে চাইছেন—।

র‍্যাফার্টি দেখলো—সামনে বসে থাকা কিম্ভূতকিমাকার চেহারার লোক দুটোর শুঁড়সমেত মাথা ঘোরালো তার দিকেই। তারপর—ঠিক তারপরই ঘটলো সেই ব্যাপারটা। র‍্যাফার্টির মনে হলো তার মাথার মধ্যে সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ও যেন উল্কা-বেগে ছুটে চলেছে মহাশূন্যে—ওর চারপাশে যেন আলোর সমুদ্র। হঠাৎ ওর মনে হলো—একশো সূর্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল এক নক্ষত্র যেন ওর সামনে আলোর সমুদ্রে ভেসে উঠছে।...র‍্যাফার্টি দেখলো তার সমস্ত শরীর কাঁপছে, শিরদাঁড়া দিয়ে নেমে যাচ্ছে আতঙ্কের এক তীব্র অনভূতি। মাত্র কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতেই অবশ্য চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল সবকিছু।

মিস্টার অ্যালসপ্, মিসেস অ্যালসপ্—।—উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠে র‍্যাফার্টি ঃ ওরা যে মহাকাশের কোনও সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে এসেছে—তাতে আমার আর সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ, সেটা তো ওরাও বলেছে।—নির্বিকারভাবে বলে ওঠেন অ্যালসপ্-কর্তা।

আপনি বুঝতে পারছেন—এর অর্থ কী?—নিজেকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারে না র‍্যাফার্টি ঃ অন্য জগতের বুদ্ধিমান প্রাণী এসেছে এখানে...আপনি বুঝতে পারছেন না—এ ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে কোনদিন ঘটেনি। আপনি—আপনি বুঝতে পারছেন না— খবরের কাগজের ক্ষেত্রে এটা কী সাংঘাতিক একটা বিষয়। আমাকে

এর একটা প্রমাণ রাখতেই হবে। আচ্ছা, আপনাদের টেলিফোনটা কোথায় ?

আমাদের বাড়িতে তো টেলিফোন নেই।—অ্যালসপ্‌-কর্তা বলে ওঠেন ঃ টেলিফোন পাবেন এই গ্রামের বাইরে পেট্রোল-পাম্পে। তা, আপনি এমন ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? একটু পরেই তো ওরা চলে যাবে। আমাদের দেওয়া ডিমগুলো আর সেই ডিমে তা-দেবার সরঞ্জাম তো ওরা আগেই ওদের উড়োজাহাজে তুলে দিয়েছে। ওদের বিদায় নেওয়া পর্যন্ত নাহয় সবুর করে যান—

না—না—না।—হিস্টিরিয়ার রোগীর মতো মাথা নাড়তে থাকে র‍্যাফার্টি ঃ আপনারা বুঝতে পারছেন না—এত তাড়াতাড়ি ওদের কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া যায় না। এই মুহূর্তে একজন ফোটো-গ্রাফারকে দরকার—।

আরে আমরাও কি আর ওদের কম বাধা দিয়েছি!—অ্যালসপ্‌-গিন্নীর মুখে সরল হাসি ঃ কত করে বললাম—রাতের খাওয়াটা সেরে যাওয়ার জন্য—তা ওরা কি আর শোনে! আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই নাকি ওদের চলে যেতে হবে ; চাঁদের অবস্থান-টবস্থান দেখে নাকি ওদের যাত্রা শুরু করতে হয়।

হতাশ চোখে র‍্যাফার্টি ঘরের এদিক-ওদিক চায়। ইস্‌ যদি একটা টেলিফোন থাকতো—এক্ষুনি ও ফোন করে জানিয়ে দিতে পারতো চীফ্‌-এডিটরকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ওর কথাগুলোকে মাতালের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতো না তো সবাই ?

র‍্যাফার্টির সম্বিত ফেরে। অ্যালসপের দিকে তাকিয়ে বলে,—আপনাদের কাছে কি ক্যামেরা আছে ? যে কোনরকম হলেই চলবে। এদের একটা ফটো আমাকে তুলতেই হবে।

ওঃ, ক্যামেরা ? নিশ্চয়ই আছে।—অ্যালসপ্‌-কর্তাকে বেশ হাসি-খুশি দেখায় ঃ যদিও পুরনো আমলের বাক্স-ক্যামেরা—কিন্তু ছবি ওঠে চমৎকার। আমার হাঁস-মুরগীর যে কত ছবি তুলেছি! দেখবেন নাকি ?

উঁহু, ছবি নয়—ক্যামেরাটা আনুন শীগ্‌গীর।—উত্তেজনায় ঘরময় পায়চারি শুরু করে র‍্যাফার্টি।

এক মিনিট, আনছি।—অ্যালসপ্‌-কর্তা দরজার পর্দা সরিয়ে ভেতরে গেলেন।

মিসেস অ্যালসপ্‌—।—চেঁচিয়ে ওঠে র‍্যাফার্টি ঃ আমার অনেক

প্রশ্ন আছে। আমাদের এখানকার ডিম নিয়ে ওঁরা কী করবেন? ওঁদের মহাকাশযানটা কিসে চলে? ওঁদের জগতের অবস্থানটা ঠিক কোথায়? ওঁরা—

প্রশ্ন শেষ করার আগেই অ্যালসপ্-কর্তা ঘরে ঢোকেন।—ওগো শুনছো? ক্যামেরাটা কি তুমি দেখেছো? কোথায় গেল ওটা? অবশ্য ফিল্ম-টিল্ম কিছু নেই ওর মধ্যে—

ধপ্ করে চেয়ারের ওপর বসে পড়তেই র‍্যাফার্টি দেখে—মহাকাশে আগন্তুক দুজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কেমন শুঁড় নাড়তে থাকে; বোধহয় নিজেদের মধ্যে কোন শলা-পরামর্শ সেরে নেয়। আর তারপর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই বিদ্যুৎবেগে ওরা বেরিয়ে যায় ঘরের বাইরে, বাগানের দিকে।

আপনারা থামুন!—ভাঙ্গা-গলায় আর্তনাদ করতে করতে র‍্যাফার্টি ছুটলো তাদের পেছনে। বাগানের কাছে পৌঁছোনোর আগেই ইঞ্জিনের মৃদু গর্জন কানে আসে। আর তারপরই—র‍্যাফার্টির ছানাবড়া-হয়ে-যাওয়া চোখদুটোর সামনে বিশাল সেই প্লাস্টিকের বেলুনটা ছোট্ট লাফ খেয়ে ওপরে উঠেই সাঁ-করে সন্ধ্যের আকাশে বেমালুম মিলিয়ে যায়।

হতাশভাবে বাগানের কাদার ওপরেই বসে পড়লো র‍্যাফার্টি। কোন ছবি নেই, কোন প্রমাণ নেই—পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা রিপোর্ট করার এমন সুযোগটা ভিনগ্রহীদের মতোই মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল!

আহা, একটা কিছু প্রমাণ থাকলেও 'দ্য টাইম্স্'এর প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে লেখা বেরুতো—'গত রবিবার স্থানীয় আলফ্রেড অ্যাল্সপের খামার-বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিল ভিনগ্রহের শ্রীমান ও শ্রীমতী—; ফিরে যাবার সময় তাঁরা দু-টুকরি মুরগীর ডিম সঙ্গে করে নিয়ে যান—

নাঃ, কোনও প্রমাণ নেই। প্রমাণ ছাড়া এসব কথা কেউ বিশ্বাস করে না।

হঠাৎ বিদ্যুতের ঝিলিক্ খেলে যায় র‍্যাফার্টির মাথায়। ঊর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটে আসে বসার ঘরে।

—একটা কথা, মিস্টার অ্যালসপ্। ওদের কাছ থেকে কি আপনার ডিমের দাম পেয়েছেন?

অ্যালসপ্‌-কর্তা তখনও চেয়ারে উঠে তাকের ওপর ক্যামেরা খুঁজে চলেছেন। র‍্যাফার্টির কথা শুনে নেমে দাঁড়ালেন মেঝেয়।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। এসব ব্যাপারে ওঁরা অত্যন্ত ভদ্র।

দেখি তো ওদের পয়সাগুলো।—র‍্যাফার্টি পারলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

—দূর্‌ মশাই, পয়সা কোথায় দেখছেন? ছ-বছর আগে প্রথমবার ডিম নেওয়ার বিনিময়ে ওরা নিজেদের দেশের কটা ডিম দিয়েছিল আমাদের।

ছ-বছর আগেকার ডিম!—র‍্যাফার্টি যেন বিষম খায়ঃ কিসের ডিম?

—তা কি করে বলবো? তবে আমাদের এখানকার মতো গোলগাল নয়, ওদের ডিমগুলো দেখতে ছিল ঠিক নক্ষত্রের মতো। সেও কি আজকের কথা? দেখতে দেখতে ছ-বছর কেটে গেল—

—তা, ডিমগুলোর কী হলো শেষ পর্যন্ত?

—দুটো ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়েছিল। সে কী বদখৎ চেহারার প্রাণী—আপনাকে আর কী বলবো! তবে হ্যাঁ, ছ-টা করে পা ছিল প্রত্যেকের। মহাকাশের বন্ধুদের সঙ্গে মোলাকাৎ-এর কথা ভাবতে ভাবতে একদিন ঐ কিম্ভুৎ পাখী দুটোকে কেটেকুটে রান্না করে খেয়ে ফেল্লাম—।

র‍্যাফার্টির গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। অ্যালসপের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে,—ওদের হাড়গোড়গুলো এখন কোথায় আছে বলতে পারেন?

অ্যাঁ?—অ্যালসপ্‌ কেমন করে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যানঃ আপনি, ওদের হাড়গোড়ের হদিশ জানতে চাইছেন? সেগুলো তো আমরা খেতে দিয়েছিলাম আমাদের বাড়ির পোষা কুকুরটাকে। তা, সে কুকুরটাও তো মারা গেছে বছর কয়েক আগে।

অ্যালসপ্‌দম্পতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে প্রায় বেসামাল পা ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল র‍্যাফার্টি, সম্বিত ফিরলো আলসপ্‌-কর্তার ডাকে।

—আরে ও মশাই, দাঁড়ান দাঁড়ান। এই এতক্ষণে খুঁজে পেলাম ক্যামেরাটা।

ক্রীতদাস

গ্লেব অ্যানফিলভ

সাইরেনের তীক্ষ্ন শব্দ কানে আসতেই টেলিফোনের রিসিভারটা ঝটিতি টেনে নিলো স্প্যাস্কি। বাঁ-হাতের তর্জনী দিয়ে ফোনের ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে ডান হাতের আঙুল দিয়ে কারখানার নিরাপত্তার জন্য নির্দিষ্ট সুইচগুলোকে টিপে যাচ্ছিল ও।

রোবট-বিশেষজ্ঞ যে ভদ্রলোককে ফোনটা করা হচ্ছিল তিনি ফোনটা ধরতেই চেঁচিয়ে উঠলো স্প্যাস্কি।

—সর্বনাশ হয়ে গেছে এখানে। আমি কিছু করতে পারছি না।

কী? কী ব্যাপার?—রোবট-বিশেষজ্ঞ স্প্যাস্কির কথা বুঝতে পারছিলেন না।

—আসলে, কারখানায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে! ভেতরের দেয়ালে একটা ফাটল ধরেছে—সিলিকন তোড়ে বেরিয়ে আসছে তার মধ্যে দিয়ে!

—সিলিকন বেরোনো বন্ধ করা যাচ্ছে না?

—বললাম যে, দেয়ালে একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে—

—তাহলে তো এক্ষুণি তা মেরামত করতে হয়।

তাতো বটেই। আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি—ওই ফাটলটা মেরামত করতে কি আমি 'এরেম'-কে পাঠাতে পারি?

এরেম?—ভদ্রলোক কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলেন: ও কি পারবে? দেখুন, যা ভাল বোঝেন—

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে 'মেরামতী যন্ত্র' চিহ্নিত সুইচে আঙুল রাখলো স্প্যাস্কি। কয়েক সেকেন্ড পরেই দরজা খুলে এরেম এসে দাঁড়ালো ঘরের ভেতর। ওর চার-চারটে স্ফটিক-লেন্স প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলো স্প্যাস্কির দিকে।

আমাদের এই বিশাল 'ক্রিস্টালাইজার' যন্ত্রের সব ব্যাপার-স্যাপার তো তুমি জানো। ওটা দক্ষিণ দিকের দেয়ালের একটা বিচ্ছিরি ফাটল দিয়ে গলন্ত সিলিকন বেরিয়ে আসছে।—স্প্যাস্কি ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করে: তবে ঠিক কোথায় যে ফাটলটা তৈরী হয়েছে

তা তোমায় বলতে পারবো না বাপু। আসলে তারগুলো পুড়ে গিয়ে টেলিভিসনটা কোন কাজ করছে না কিনা—

ভেতরে গরমটা কেমন ?—ক্যাঁচক্যাঁচে গলায় জিজ্ঞাসা করলো এরেম।

—হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। অবশ্য তাপমাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

—কতটা তরল রয়েছে ক্রিস্টালাইজারের মধ্যে ?

দশ লক্ষ টন।—স্প্যাস্‌কির চট্‌পট্‌ জবাব ঃ তাপ নিরোধক জিনিসপত্তর সব মেসিনের ভেতরে ঢোকার মুখে বাঁদিকে পাবে। এবার তাহলে ভেতরে ঢুকে পড়ো। তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফ্যালো।

এরেম ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই স্প্যাস্‌কি গা এলিয়ে দিলো চেয়ারে, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত বাড়ালো সিগারেটের প্যাকেটের দিকে।

স্প্যাস্‌কি যখন সিগারেটে প্রথম সুখটান দিতে যাচ্ছে, এরেম তখন যান্ত্রিক পদক্ষেপে ক্রিস্টালাইজারের মধ্যে ঢুকে দরজা দিয়েছে। ঢুকতেই আগুনের তীব্র হল্কা এসে লাগে গায় ; ওখানকারই তাপমাত্রা পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস। এরেম প্রথমেই দেখে নিলো—ওর বুদ্ধি এবং স্মৃতির জন্য নির্দিষ্ট স্ফটিকদুটি কাজ করছে কিনা। এর জন্য দু-সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হলো ওকে। তারপর একটু এগিয়ে আর একটা দরজা খুলে যন্ত্রের কেন্দ্রীয় অংশে পা রাখলো ও। ভেতরে ঢুকতেই সামনে সিরামিকের দেয়াল—হাজার ডিগ্রি উষ্ণতায় সে দেয়ালের রঙ টকটকে লাল। এরেম দেখলো, মাথার ছাদ থেকে মিটার আষ্টেক নিচে দেয়ালের গায় একটা এবড়ো-খেবড়ো ফাটল—আর তা দিয়ে আগুনের ধারায় বেরিয়ে আসছে গলন্ত সিলিকন ; আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিট্‌কে যাচ্ছে চারদিকে।

ফাটলটা দেখতে পেয়েছি।—রেডিও-টেলিফোনে খবরটা জানিয়ে দিলো এরেম।

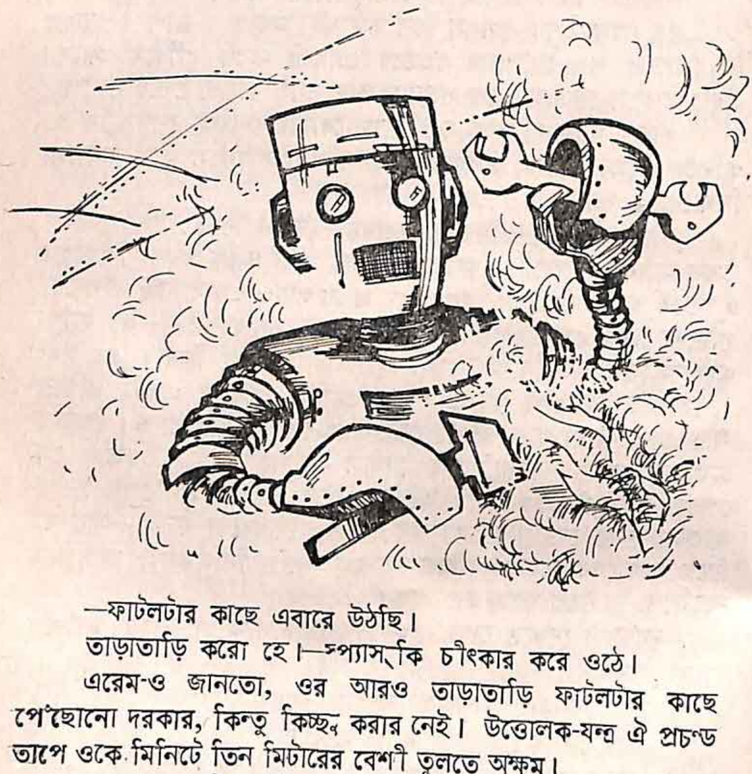
বেশ বড়সড় ?—জিজ্ঞাসা করলো স্প্যাস্‌কি।

—এই মিটার তিনেকের মতো লম্বা।

কাজটা তাহলে শুরু করে দাও।—স্প্যাস্‌কি নির্দেশ দেয়।

শিরা-উপশিরার মতো অসংখ্য ধারায় ভারী-তরল নেমে আসছে দেয়ালের গা বেয়ে। ওগুলোকে পেরিয়ে ফাটলের কাছে পেঁছোনো বেশ কঠিন ! এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো এরেম, তারপরই লম্বা হাতওয়ালা সাঁড়াশীর মতো যন্ত্রের সাহায্যে আগুন-নিরোধক

তুলো টেনে আনলো দরজার কাছ থেকে। এবারে ওকে ফাটলটার কাছে যেতে হবে। ওর পায়ের তলার যে যন্ত্রাংশটা ওকে লিফ্‌টের মতো ওপরে তুলে দেবে সেটাকে শেষবারের মতো পরীক্ষা করে নিলো এরেম। ফাটলের চারপাশের তাপমাত্রা বারশো ডিগ্রি। এরেম জানে যে যন্ত্রপাতিগুলি দিয়ে ও কাজ করবে তাদের তাপ সহ্য করার ক্ষমতা আর মাত্র শ-খানেক ডিগ্রির কিছু বেশী। উত্তোলক-যন্ত্রটাকে চালু করলো ও।



—ফাটলটার কাছে এবারে উঠছি।

তাড়াতাড়ি করো হে।—স্প্যাস্‌কি চীৎকার করে ওঠে।

এরেম-ও জানতো, ওর আরও তাড়াতাড়ি ফাটলটার কাছে পেঁছোনো দরকার, কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। উত্তোলক-যন্ত্র ঐ প্রচণ্ড তাপে ওকে মিনিটে তিন মিটারের বেশী তুলতে অক্ষম।

এরেমের শরীরের উপরের দিকের দুটো যন্ত্রাংশ—যেগুলিকে অনায়াসেই ওর হাত বলে ধরে নেওয়া যায়—তাদের সাহায্যে মাঝে মাঝে দেয়ালে ভর দিচ্ছিল ও। যতই ওপরে উঠছিল দেয়লের গায়ে গলন্ত সিলিকনের ধারাগুলি চওড়ায় বাড়ছিল ততই। ফাটলটার

কাছাকাছি আসতেই এরেম টের পেলো—দেয়ালের ফাঁক দিয়ে গলন্ত সিলিকন্ ছল্‌কে ছল্‌কে বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ কিছু বোঝার আগেই এক ঝলক উত্তপ্ত সিলিকন্ এসে পড়লো দেয়ালের গায়ে ভর দেয়া ওর একটা হাতে। এরেম টের পেলো—ঐ প্রচণ্ড তাপে দুমড়ে-মুচড়ে ঐ হাতটা ওর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচের মেঝেয় গিয়ে পড়লো। ওর ভারী শরীরটাও টাল সামলাতে না পেরে পড়েই যাচ্ছিল ; শেষমুহূর্তে এরেম কোমর থেকে একটা বাড়তি যন্ত্রাংশ দেয়ালের দিকে বাড়িয়ে ধরে নিজের পড়ে যাওয়াটা আটকালো।

কাজ কেমন চলছে?—হেড্‌ফোনে স্প্যাস্‌কির গলা শোনা যায় ঃ এত চুপচাপ কেন?

আমি ফাটলটার দিকে উঠছি।—ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দেয় এরেম।

উত্তোলক-যন্ত্রটা ওকে দেয়ালের আরও কাছে নিয়ে যেতে পারছিল না। যন্ত্রের সঙ্গে পায়ের সংযোগটা ছিন্ন করতেই দেয়ালের দিকে অবশ্য আর একটু এগিয়ে যেতে পারলো এরেম। যে যন্ত্রাংশ দিয়ে ওর ভাঙ্গা হাতটা কাজ চালাচ্ছিল, সেটাকে ফাটলের দিকে বাড়িয়ে ধরতেই এরেম টের পেলো—ফাটলটা ওর থেকে মাত্র দু-মিটারের মধ্যেই। হ্যাঁ, এখানে দাঁড়িয়ে ফাটলটা মেরামত করা সম্ভব—এরেম মনে মনে ভাবলো।

তাপমাত্রা ইতিমধ্যে পনেরোশো ডিগ্রি ছাড়িয়েছে! সামনের দেয়ালটা কেমন যেন অস্পষ্ট ঠেকছে।

হঠাৎ ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসা তরলের মধ্যে স্প্যাস্‌কির মুখটা যেন একবার ভেসে উঠলো। স্বভাবতই এতে একাগ্রতা নষ্ট হলো। ওর ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক যাতে ঠিকমতো কাজ করে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালালো এরেম।

গরমটা যেন ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে। এরেম টের পেলো—ওর বুদ্ধিকে চালনা করে যে স্ফটিকখণ্ড, তাও নষ্ট হতে চলেছ। অথচ ওটা পুরোপুরি অকেজো হবার আগেই মেরামতের কাজটা সারতে হবে। অ্যাস্‌বেস্‌টসের জ্যাকেট ফুঁড়ে প্রচণ্ড তাপ ওর শরীর ঝল্‌সে দিচ্ছিল। ওর চারটে চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরোচ্ছে, তা সত্ত্বেও মনস্থির করে ঐ ফাটলটা সারাই-এর জন্য যা করণীয় তা ঠিক করে নিচ্ছিল এরেম। একবার মনে হলো—ঐ প্রচণ্ড তাপে আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুঝি গোটা শরীরের কলকব্জাগুলি সব অকেজো হয়ে যাবে। আঃ, এই সময়ে যদি কয়েক সেকেণ্ডের জন্যেও একটু ঠাণ্ডা হওয়া যেত! শরীরটাকে জুড়িয়ে নেবার উপায় যে নেই তাও

নয়। চারপাশের পাখাগুলো চালিয়ে দিলেই হয় কিন্তু সেটা করা একেবারেই বারণ। তাতে গলন্ত সিলিকন জমে যাবার সম্ভাবনা থাকে। খানিকটা দ্বিধার সঙ্গেই ফোনের মধ্যে দিয়ে স্প্যাস্কিকে জিজ্ঞাসা করলো এরেম,—মাত্র কুড়ি সেকেণ্ডের জন্য কি পাখাগুলো চালাতে পারি?

না।—স্প্যাস্কির উত্তর তৈরী ছিল ঃ কোন অবস্থাতেই নয়। সিলিকন সব নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, তুমি এতক্ষণ ধরে কী করছো ওখানে বলতো?

—মেরামতের কাজটা শুরু করছি।

এরেম জানতো—স্প্যাস্কি পাখা চালানোর অনুমতি দেবে না। অথচ ব্যাপারটা ওর কাছে প্রায় মৃত্যুদণ্ডের সামিল! তা হোক, ও তো আসলে একটা যন্ত্র বই কিছু নয়। দশলক্ষ টন সিলিকনের দাম নিশ্চয়ই ওর তুলনায় অনেক অনেক বেশী। এরেম শান্তমনে কাজ শুরু করে।

শরীরের মধ্যে পোড়ার যে যন্ত্রণা হচ্ছিল তাকে আর গুরুত্ব না দিয়ে এরেম ওর কোমরের সঙ্গে বাঁধা যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে একটা লম্বাটে সাঁড়াশী ধরনের জিনিস বের করলো। যন্ত্রটার ডগায় বেশ খানিকটা তাপ-নিরোধক তুলো গুঁজে নিয়ে ফাটলটার দিকে এগিয়ে ধরলো এরেম। তরলের স্রোত অবশ্য তাতে বন্ধ হলো না—উল্টে সাঁড়াশীটাই বেঁকে-দুমড়ে পড়ে গেল নীচে।

একটা হাত অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে, বাকী একটামাত্র হাত দিয়েই কাজ সারতে হচ্ছিল ওকে। ঐ হাত দিয়েই আগেরটার মতো আরেকটার যন্ত্র টেনে বের করলো এরেম। আবার আগের মতোই তাতে খানিকটা তাপ-নিরোধক তুলো নিয়ে ফাটলটার মুখে চেপে ধরার চেষ্টা করলো। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক আগের বারের মতোই যন্ত্রটার টাংস্টেনের তৈরী হাতল দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে পড়লো নীচে।

কেমন যেন সব গোলমাল ঠেকছে! এরেমের মনে হলো—বুদ্ধি যেন আর কাজ করছে না। জন্মের পর প্রথম দিনের স্মৃতি হঠাৎ ভেসে উঠলো মনের মধ্যে। মন থেকে সব স্মৃতি ঝেড়ে ফেলে কাজে মনোযোগ দেবার বৃথাই চেষ্টা করলো এরেম। পুরনো দিনের সব ঘটনা—যে কারখানায় ওকে তৈরী করা হয়েছিল সেখানকার লোকজনের মুখ, জীবনের সেই প্রথম আলো দেখার আনন্দ—এরেমের মনে বারবার ভেসে উঠছিলো। কারখানার যন্ত্রপাতি, লোকজনের কথাবার্তা—সব-কিছুকে ছাপিয়ে উঠছিল সেই একজনের উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর ঃ আমাদের

আমাদের নতুন বুদ্ধিমান রোবট, তোমাদের অস্তিত্বকে স্বাগত জানাই। কিছুক্ষণের স্তব্ধতা, তারপরই এরেমের খেয়াল হলো—সাঁড়াশী ধরনের যন্ত্র আর একটাই অবশিষ্ট আছে ওর কাছে—তাই দিয়েই শেষ চেষ্টাটা চালাতে হবে। আবার বেশ খানিকটা তুলো নিয়ে ফাটলের মুখে ঠেসে ধরলো ও। হ্যাঁ, এবার আর লক্ষ্যে ভুল হয়নি। তাপ নিরোধক তুলো গলন্ত সিলিকনের স্রোতকে আটকাতে পেরেছে! যন্ত্রটাকে টেনে নিয়ে তার ডগায় আবার নতুন করে তুলো আটকে নেয় এরেম।....তৃতীয়বারে নেওয়া তুলোর স্তূপটা ফাটলের মুখটা পুরো-পুরি বুজিয়ে দিলো। কাজ শেষ, এবার নেমে আসতে হবে....।

কেউ যেন টেলিফোনে কিছু বলছে—স্প্যাস্কি হবে বোধহয়। এরেম অতিকষ্টে কথা বলার চেষ্টা করলো,—মেরামত হয়ে গেছে। কাজটা শেষ।

এলোমেলো চিন্তা আবার ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। ওদের মতো বুদ্ধিসম্পন্ন রোবটদের যেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেই জায়গার ছবিটা এরেমের মনের মধ্যে ফুটে উঠছিল। ওদের শিক্ষক কালিস্তভের চীৎকার বাজছিল কানের মধ্যে ঃ 'উঠে দাঁড়াও! ওই বাঁদিকের দেয়ালটা ধরে এগিয়ে যাও, ঘরের ছাদটাকে ধরতে চেষ্টা করো।....' প্রশিক্ষণ-কেন্দ্রে থাকাকালীন শেষ দায়িত্বটার কথা মনে পড়ছিল ওর—সেই সমুদ্রের গায়ে পাথরের স্তূপ জড়ো করে বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা...., চেষ্টাটাকে বিফলে যেতে দেয়নি এরেম। অতীত দিনের টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো মনের মধ্যে ভাসছিল ওর।

এরেম খেয়াল করেনি, কখন যে ওর শরীরের তলার অংশটা খসে পড়ে গেছে! সব জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান! শরীরের মধ্যেকার কেন্দ্রীয় মোটরটাও ঘড়্ ঘড়্ শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল। ভাঙ্গা রেকর্ডের মতো একটা আওয়াজ ভেতরের কোন যন্ত্র থেকে বারে বারে বেরিয়ে আসছিল,—কাজটা হয়েছে, কাজটা হয়েছে, কাজটা হয়েছে....

স্প্যাস্কি সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে ফিল্টারের অংশটাকে অ্যাস্ট্রেতে গুঁজে দিলো। তারপর টেলিফোন-রিসিভারটা কাছে টেনে নিয়ে রোবট-বিশেষজ্ঞের নম্বরটা ঘোরাতে শুরু করলো।

—সব ঠিক হয়ে গেছে ; ক্রিস্টালাইজার এখন ঠিকমতো কাজ করছে।

এরেমের খবর কি ?—বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক জানতে চান।

—কাজটা হয়েছে, কাজটা হয়েছে—এ শব্দটাই শুধু বারবার শুনতে পাচ্ছি।

খুব দুঃখের কথা।—টেলিফোনের অন্যপ্রান্ত থেকে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে ভেসে আসে ঃ সত্যিই দুঃখের….বুঝতে পারছি না, এরেমকে আবার ঠিক করে নেওয়া যাবে কিনা। যাই হোক আপনার ঐ মৌসনঘর থেকে গলন্ত সিনিকন বের করে নেওয়ার পর একবার জানাবেন। আমি গিয়ে ওর অবস্থাটা একবার দেখবো।

আচ্ছা জানাবো। বলেই খট্ করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো স্প্যাস্কি।

সবুজ মানুষ

ক্লিফোর্ড সিম্যাক

অফিস্ থেকে বাড়ী ফিরে যেই আমি জানলার দিকে মুখ করে বসি, অমনি চোখে পড়ে পাড়ার সেই নচ্ছার কুকুরটার কাণ্ডকারখানা। জানলার সামনে রাখা ডাস্টবিনের ময়লা আবর্জনাগুলোকে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে কুকুরটা যে কী আনন্দ পায়! ডাস্টবিনের ঢাকনিটার ওপর কতদিন যে থান ইঁট চাপা দিয়েছি, কতদিন পাথর ছুঁড়ে মেরেছি ঐ কুকুরটাকে! জঞ্জাল ঘাঁটার নেশা কিন্তু ওর ছোটেনি।

সেদিনটার কথা মনে পড়ে। সক্কালবেলায় টেলিফোনে বুড়ো পিট্-এর গলা পেলাম।

—একবার আমার এখানে আসতে পারো?

—আসছি। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—আমার বাগানের উত্তর দিকের অনেকটা জায়গা থেকে কারা যেন অনেকখানি মাটি খুবলে নিয়ে গেছে। আর তার বদলে ঐ বিশাল গর্তের পাশে পড়ে রয়েছে খানিকটা ঝুরঝুরে বালি!

পিট্-এর কথায় আমারও কেমন ধাঁধা লাগে। ওর বাগানে লোকে গর্ত খুঁড়তে যাবে কেন? তাছাড়া ওর জমির কাদামাটির পাশে বালির ঢিপিই বা আসে কোত্থেকে?

ফোন নামিয়ে আমি পিট্-এর বাড়ীর দিকে রওনা দিই।

আমাদের এই ছোটখাটো শহরটাকে মফঃস্বলই বলা উচিৎ। এখানকার বাসিন্দাদের প্রায় সবাই সবাইকে চেনে। পিট্-এর মতো অনেকেই আবার আমার ওপর একটু বাড়তি ভরসা করে থাকে। আমি নাকি নানাজনের নানা সমস্যার সমাধান করতে পারি!

বাগানেই দাঁড়িয়েছিল পিট্। সঙ্গে আরও জনাকয়েক পাড়া-পড়শী। মাটির ওপর হাঁ করে থাকা এক বিশাল গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে ওরা ভীষণ উত্তেজিতভাবে কী যেন বলাবলি করছিল।

গোলাকার গর্তটার দিকে ভাল করে তাকালাম। ব্যাস হবে আন্দাজ তিরিশ ফুট। আর গভীরতাও পঁয়ত্রিশ ফুটের কম নয়। এমন সুন্দরভাবে চারপাশের মাটি কাটা হয়েছে যে গর্তটা একেবারে নিখুঁত শঙ্কুর আকৃতি নিয়েছে। কোদাল-বেল্চা দিয়ে এমন মসৃণ-ভাবে মাটি কাটা যায় না ; নির্ঘাৎ কোনও মেসিনের কাজ। গর্ত থেকে একটু দূরেই সাদা বালির স্তূপ। কেন জানি না মনে হলো, ঐ বালি দিয়ে গর্তটাকে কানায় কানায় ভর্তি করা চলে। আশেপাশে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চালিয়েও কোথাও কোন গাড়ী অথবা ট্রাকের চাকার দাগ চোখে পড়লো না।

আমার হঠাৎ মনে হলো—এখানকার মাটি পরীক্ষা করা দরকার। এটা মনে হতেই আর দেরী করলাম না। পিট্-এর বাড়ী থেকে দু-খানা কৌটো যোগাড় করে তার একটাতে ঐ গর্তের মাটি আর অন্যটাতে বালির ঢিপি থেকে খানিকটা বালি চট্পট্ পুরে ফেললাম।

বাড়ী ফিরেই শুনলাম, ব্যাঙ্ক-মালিক স্টিভেন্স্ নাকি ফোন করেছিলেন। সময়-সুযোগ মতো আমাকে একবার ওঁর বাড়ীতে যেতে বলেছেন। ভদ্রলোকের একটা বিরাট বাগান আছে জানতাম। শুনে-ছিলাম, সেই বাগানে নানা জাতের দেশী-বিদেশী ফুল ফোটানোই ওঁর একমাত্র নেশা। নিশ্চয়ই ঐ বাগানের ব্যাপারেই আমার সাহায্য প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক কিংবা টাকা-পয়সার ব্যাপারটা যে আমি তেমন বুঝি না, তাতো ওর অজানা নয়।

আমার ধারণাটা যে নির্ভুল তার প্রমাণ পেলাম খানিক-পরেই। মাটি পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট এক ল্যাবরেটরীতে পিট্-এর বাগানের মাটি আর বালির নমুনা পৌঁছে দিয়ে স্টিভেন্স্-এর সঙ্গে দেখা করতেই ভদ্রলোক একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, আমার বাড়ীর পেছনের বাগানটায় একবার চলুন। কত দিনের চেষ্টায় যে বিশেষ জাতের সব ফুলের বীজ যোগাড় করে তা থেকে গাছ বানিয়েছি! কে আমার এমন সর্বনাশ করলো?

অতঃপর স্টিভেন্‌সের সঙ্গে ও'র সাধের বাগানে গেছি এবং সেখানকার দৃশ্য আমার কাছেও যথেষ্ট মর্মান্তিক ঠেকেছে। অতবড় বাহারী বাগানটায় একটাও জ্যান্ত গাছ চোখে পড়েনি। কে যেন ভীষণ আক্রোশে বাগানটাকে একেবারে মুড়িয়ে রেখে গেছে!

স্টিভেন্‌সের কোন শত্রু বিষাক্ত ওষুধ-টষুধ ছিটিয়ে গাছগুলো নষ্ট করে দিয়েছে কিনা ভাবতে ভাবতে জমির ওপর এদিক-ওদিক ছড়িয়ে থাকা ফুলগুলোর দিকে নজর দিতেই গর্তগুলো চোখে পড়লো। অগুন্তি ছোট ছোট গর্ত ছড়িয়ে রয়েছে সারা বাগান জুড়ে! সাধারণতঃ জমি থেকে আগাছা টেনে তোলার পর যে ধরনের গর্ত থেকে যায় ঠিক তেমনিই দেখতে লাগছিল ওগুলোকে।

এরমধ্যে কি বাগান থেকে আগাছা তুলেছেন?—স্টিভেন্‌স্‌-কে জিজ্ঞাসা করি।

তাতো তুলেছি। সব সময়েই তুলি।—স্টিভেন্‌স্‌ উত্তর দেন ঃ ফুলগাছদের বাঁচিয়ে রাখতে হলে আগাছা তো তুলতেই হয়। তবে কথা হলো কি জানেন—বাগানের সাধারণ আগাছা উপড়ে নিলে জমিতে যেটুকু গর্ত হয়—এই গর্তগুলো তার তুলনায় অনেক বড়। গোলমালটা তো ওখানেই।

বলাবাহুল্য, প্রায় আধঘন্টাটাক অপেক্ষা করার পরও রহস্যভেদের কোন সূত্র খুঁজে না পেয়ে আগের বারের মতোই স্টিভেন্‌স্‌-এর বাড়ী থেকেও একটা টিনের কৌটো যোগাড় করেছি এবং যথারীতি তার মধ্যে গর্তের মাটির নমুনা পুরে রওনা দিয়েছি বাড়ীর দিকে।

বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই টের পেলাম—রাস্তার কুকুরগুলো বড় একটা ঝোপের কাছে জড়ো হয়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। নির্ঘাৎ ঐ ঝোপের মধ্যে বেড়াল-টেড়াল ঢুকেছে—ভাবতে ভাবতে ঝোপের দিকে এগিয়ে যাই। কুকুরগুলো বোধহয় আমাকে দেখেই এক এক করে সরে পড়ে। ঝোপের মধ্যে কী আছে তা দেখতে গিয়েই চোখে পড়লো সেই অদ্ভুত জিনিসটা।

জিনিসটাকে আগাছা বলাই ভাল; যদিও ওটা প্রায় ফুট-পাঁচেকের মতো উঁচু। সত্যি বললে, আমার চেনা তো নয়ই—এমন অদ্ভুত শিকড়ওয়ালা কোন আগাছা যে পৃথিবীতে জন্মায় সেটাই ধারণায় ছিল না আমার। আগাছার গোড়ার দিকটা মানুষের কব্জির মতো মোটা; ওর মাঝামাঝি থেকে গোটা চারেক শাখা বেরিয়েছে আর একদম আগায় ফুটে আছে অদ্ভুত ধরনের কয়েকটা ফুল।—তেমন ফুল আমি জন্মে দেখিনি।

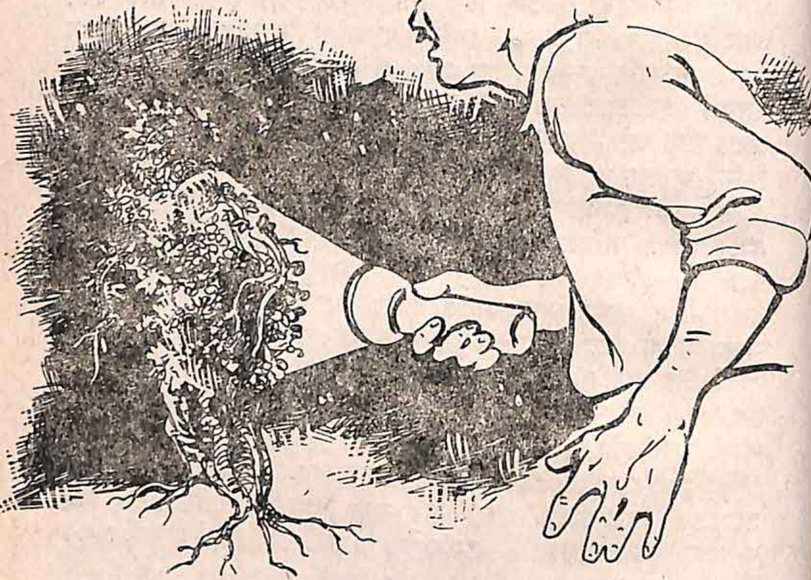
দিনের আলোয় ভাল করে দেখবো বলে আগাছাটাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম বাড়ীতে—রেখে দিলাম লনের একপাশে। বাড়ীতে একা থাকি, রান্নাবান্না নিজেকেই করতে হয়। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় শুয়েই মনে হলো—আগাছাটাকে লনের মধ্যে ফেলে না রেখে ঘরে নিয়ে আসি। বারান্দার আলো জেবলে ঘরের বাইরে বেরোতেই চম্‌কে উঠলাম। আগাছাটাকে যেখানে রেখেছিলাম সেখান থেকে ওটা সরে গেছে লনের অন্য কোণে এবং ডালপালা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে লনের পাঁচিল। মানুষের মতোই ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওটা—যেন এক্ষুণি পাঁচিল ডিঙোবে! সেই মুহূর্তে আমি সত্যিই ভয় পেলাম এবং কেন জানি না—বারান্দার একপাশে রাখা কুড়ুলটাকে তুলে নিলাম হাতে। হয়তো ভেবেছিলাম—আগাছাটা যদি পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে যেতে চায় তবে কুড়ুল দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। কয়েক মিনিট কাটলো ওইভাবে, তারপর দেখি ওটা আস্তে আস্তে পিছু হট্‌ছে। কী যে মনের মধ্যে হয়ে গেল আমার! কুড়ুলটা ঠক্ করে মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে বাগানে জল দেওয়ার বালতিটায় জল ভরে তার মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম আগাছার মূলগুলো। ঘরে ফিরে এসে মনে হলো—জল ছাড়া অন্য কোনও খাবার তো ওকে দেওয়া হলো না। সঙ্গে সঙ্গে ফের বাগানে গিয়ে খানিকটা মাটি তুলে ফেলে দিলাম বালতিটার মধ্যে। রাত্তিরে তো সূর্যের আলো পাবার সম্ভাবনা নেই, সেজন্য বারান্দার জোরালো আলোর নীচে টেনে আনলাম আগাছা-শুদ্ধু বালতিটাকে।

গাছের বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার তার সবই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুতে গিয়ে যেই আগাছাটার কথা ভেবেছি—অমনি আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন এক শিহরণ বয়ে গেল।

হঠাৎ মনে হলো, ঐ আগাছা অপার্থিব নয়তো? পৃথিবীর যেসব গাছপালাকে আমরা চিনি, তারা কি কখনও মাটির ওপর চলে ফিরে বেড়াতে পারে? কাউকে বললে হয়তো হোঃ, হোঃ করে হেসে উঠবে—আমার কিন্তু নিশ্চিতভাবে মনে হলো—ওটা নিশ্চয়ই অন্য কোন গ্রহ থেকে আনা বুদ্ধিমান প্রাণী।

কিন্তু পৃথিবীতে ওটা এলো কিভাবে? আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো পিট্‌-এর বাগানের সেই বিরাট খাদ আর স্টিভেন্‌সের বাগানের অগুন্তি গর্তগুলির কথা। ওগুলোর সঙ্গে কি এই আগাছার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে? ব্যাপারটা জানতে হবে এবং

এক্ষুণি। স্টিভেন্সের বাড়ী আমার বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয়। আমার জোরালো ফ্লাশ্-লাইটটা নিয়ে স্টিভেন্সের বাগানে গিয়ে গর্তগুলোকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। লক্ষ্য করলাম, ওখানে রয়েছে ঠিক আট-সারি গর্ত ; প্রত্যেক সারিতে আবার গর্তের সংখ্যা চার। বুঝতে কষ্ট হলো না—আমার বাগানের অতিথিটিকে এই রকম একটা সারিতে রেখে দিলে এবং সেও তার শরীরের চারটে প্রশাখার সাহায্যে মাটি আঁকড়ে ধরলে ঠিক ঐরকমই চার-চারটে গর্ত হতো।



আগাছাটা তাহলে একা আসেনি ; অন্ততঃ আরও জনা সাতেক সঙ্গী নিয়ে এই বাগানে ঢুকেছিল, স্টিভেন্স্ হঠাৎ মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে উঠে আমাকে ওর বাগানে দেখলে অবাক হবে নিশ্চয়ই। তবুও আমি ফ্লাশ লাইটের জোরালো আলোয় গোটা বাগানে তন্ন তন্ন করে খোঁজ করলাম ওদের—অবশ্য একটারও দেখা মিললো না।

কোথায় গেল ওরা ?

* * *

বাড়ী এসে যেখানটায় গাছটাকে রেখেছিলাম সেখানে গেলাম। যে বালতিতে মাটি আর জল রেখেছিলাম তা ঠিক তেমনিই পড়ে

আছে—গাছটাই শুদ্ধু উধাও! বারান্দা, উঠোন আর বাগানটায় আলো জেবলে খুঁজলাম—শেষে বাড়ীর সদরের দিক্‌টায় এসে দেখি—জানলার ওপর উঠেছে ওটা। জানলার গায়ে আমার বাহারী ফুলের গাছগুলোর কি করুণ অবস্থা! আমি বিস্ময়ে হতবাক। গাছটা না হয় চলতে ফিরতে পারে, কিন্তু তাই বলে উঠোনের দিকের দরজায় তালা খুলে সদরের দিকে আসে কি করে? ঋজু, সতেজ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিল গাছটা—কি দারুণ চন্‌মনে আর প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল ওকে। জানলার সামনে দাঁড়াতেই গাছটা একটু নুয়ে পড়ে একটা শাখা বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে তারপর ঠিক যেমনভাবে বন্ধুর পিঠে হাত দিয়ে আমরা আলতো করে চাপড় মারি ঠিক তেমনিই গাছের ডালটাও বারকয়েক স্পর্শ করলো আমায়। আমার হঠাৎ মনে হলো: ভিনগ্রহের এই বুদ্ধিমান প্রাণীটি মোটেই ভয়ঙ্কর কিছু নয়, বরং আপাততঃ আমার সঙ্গে ও বন্ধুত্ব করতেই আগ্রহী। সুতরাং আমার বাগানে ওকে অনায়াসে আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। আর যদি তেমন কিছু বেগড়-বাই করে—তবে রাসায়নিক সার আর আর্সেনিক তো রয়েছেই। আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে চললাম।

পরের দিন সারাক্ষণই ব্যস্ততায় কেটেছে—সন্ধ্যেবেলা গাছটার কথা মনে পড়লো। বাগানে যেখানে লেটুস্‌ গাছগুলো রয়েছে সেখানেই দেখতে পেলাম গাছটাকে। যথারীতি আশপাশের খানকয়েক লেটুস গাছ মরে পড়ে রয়েছে। গাছটা কি তাহলে কোন অজ্ঞাত বিষ ছড়িয়ে আশপাশের গাছগুলোকে মেরে ফেলছে যাতে ওর জমিতে কেউ ভাগ না বসায়? এরকম একটা সম্ভাবনার কথা আমার মনে হচ্ছিল। গাছটা বোধহয় আমাকে দেখেই চিনতে পারলো। স্পষ্ট দেখলাম—গাছের ডালপালাগুলো নড়ে উঠল, যদিও একটুও হাওয়া ছিল না তখন।

রাতের খাওয়ার পর বাইরে বেরোতেই দেখে পাঁচিলের গায়ে আমার বাগানের অতিথির মত দেখতে গোটাকয়েক আগাছা মরে পড়ে আছে। আমার প্রতিবেশীর বাগানের দরজাতেও আরও কয়েকটা মৃত আগাছার সন্ধান মিললো। আমার প্রতিবেশীটি যে তাঁর বাগানে রাসায়নিক সার ছড়িয়ে রাখেন তা আমি জানতাম। নিশ্চয়ই ঐ রাসায়নিক বিষেই গাছগুলোর মৃত্যু ঘটেছে। তবে কি ভিন্‌গ্রহ থেকে আসা বুদ্ধিমান প্রাণীদের মধ্যে মাত্র একটাই বেঁচে আছে এবং সেটা আপাততঃ রয়েছে আমার বাগানেই?

আমার নিজের বাড়ীর দিকে ফিরে আসতে দেখি—ডাস্টবিনটার

ধারে দাঁড়িয়ে সেই কুকুরটা বিরক্তিকরভাবে আবর্জনা ঘাঁটছে ; বহুদিন কুকুরটাকে ইঁট ছুঁড়ে মেরেছি, কিন্তু লাভ হয়নি কিছু। ওটা ফিরে ফিরে প্রতিরাত্রে আসবেই।

ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। কতক্ষণ পরে খেয়াল নেই, আচম্‌কা ঘুম ভেঙে গেল কুকুরের আর্ত চিৎকারে। জানলা খুলে দেখি—কুকুরটা প্রাণপণে ছুটছে—আর পেছন পেছন তাড়া করে চলেছে আমার বাগানের ভিন্‌গ্রহী অতিথি। একটা ডাল দিয়ে সে আঁকড়ে ধরেছে কুকুরটার লেজ।

কুকুরটা যে আবর্জনা ছড়িয়ে আমাকে বিরক্ত করে তা কি আমার অতিথি বুঝতে পেরেছে ? আর তাই কি ওকে আশ্রয় দেবার প্রতিদানে ও কুকুরটার উপদ্রব বন্ধ করে আমার উপকার করতে চাইছে ? আমার হঠাৎ মনে হলো—আমি এবং গাছটা বোধ হয় পরস্পরকে খানিকটা বুঝতে পেরেছি।

পরের দিন সকালেই আমার প্রতিবেশী এসে হাজির। আমাকে দেখেই হেসে বললেন—জানেন, জেনি বলছিল আপনার বাগানে নাকি একটা গাছকে ও চলে ফিরে বেড়াতে দেখেছে। কি মজার মজার কথাই না বলতে পারে বাচ্চারা !

বুঝলাম, নেহাৎ বাচ্চা বলেই জেনি-র কথাকে কেউ গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু আমাকে তো এবার সাবধান হতে হবে। প্রতিবেশী ভদ্রলোক চলে যেতেই বাগানে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখতে পেয়ে গাছটা তার শিকড়গুলোয় ভর দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়লো। আগের মতোই ডালপাতাগুলো আলতো করে বুলিয়ে দিলো আমার গায়। আমরা দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। এখানে আশ্রয় পাওয়ার জন্য গাছটা যে আমার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞ বোধ করছে সে ব্যাপারে আমার আর বিন্দুমাত্র সংশয় রইলো না।

ফিরে যাচ্ছিলো গাছটা, আমি হঠাৎ বলে ফেললাম—অ্যাই শোন।

শুনতে যতই অবাক লাগুক, গাছটা আমার ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর একটা মানুষ যেমন পিছুডাক শুনে ফিরে আসে, ঠিক তেমনি গাছটা আস্তে আস্তে ফিরে এলো আমার কাছে। ভিন্‌-গ্রহের ঐ প্রাণীটি কি তাহলে মানুষের ভাষা বোঝে ?

দূরে রাস্তার ও পাশে কয়েকটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়েছিল—আঙুল তুলে তাদের দেখালাম গাছটাকে। মুখেও বললাম, আকারে ইঙ্গিতেও বোঝালাম—আমাদের পৃথিবীর গাছপালা কেমন মাটি

আঁকড়ে স্থির হয়ে থাকে। বাগানে ওর চলাফেরা বাচ্চাদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করবে, ও ধরা পড়ে যাবে। গাছটা যেন বুঝলো আমার কথা। তারপর আস্তে আস্তে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে এগিয়ে চললো বাগানের পরিত্যক্ত গ্রীণ হাউসটার দিকে। বছর দশেক আগে অর্কিড রাখবো বলে সখ করে বানিয়েছিলাম ওটা। অর্কিড-টর্কিড অবশ্য আনা হয়নি, ঘরটা খালিই পড়ে আছে। গ্রীণ হাউসে ঢুকে স্থির হয়ে দাঁড়ালো গাছটা। আমি বললাম,—সেই ভালো। দিনের বেলাটায় তুমি বরং এখানেই থেকো। রাত্রে বাগানে ঘুরে বেড়ালেও কেউ টের পাবে না—অবশ্য পূর্ণিমার রাতে সাবধান!

গাছটা বুঝলো আমার কথা, সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লো।

বস্তুতঃ গাছটাকে নিয়ে আর কোনও সমস্যাই রইলো না এরপর। আমি অবশ্য প্রায়ই ভাবতাম—ভিন্‌গ্রহের এই প্রাণীটি তার সঙ্গীদের নিয়ে পৃথিবীতে এলো কেন? আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, পিট্‌-এর বাগানে প্রথম দিন যে বিশাল গহ্বর দেখেছিলাম সেখানেই এসে নেমেছিল ভিন্‌গ্রহের মহাকাশযান। কিন্তু ফিরে যাবার সময় কেন সেটা ফেলে রেখে গেল তার আরোহীদের? না কি আমার অতিথি তার মত সঙ্গীদের নিয়ে চুপি চুপি নেমে পড়েছিল মহাকাশযান থেকে? কিন্তু কেন? কিসের আশায় ওরা থেকে গেছে ওদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, বিপজ্জনক এক গ্রহে? মহাকাশযানের বাকী আরোহীরা কি তাদের হারানো সঙ্গীদের ভুলে গেল, খোঁজ করলো না আর তাদের?

দিন কয়েক কাটলো গাছটাকে নিয়ে। অবসর সময়ে আমরা পাশাপাশি বসি, আমাদের পৃথিবীর পশুপাখি, গাছপালা আর মানুষের কথা ওকে বলি। একদিন একটা ইলেকট্রিক মোটরের কলকব্জা খুলে আবার তা এক এক করে জুড়লাম ওর সামনে বসে। ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম—কিভাবে বিদ্যুৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করি আমরা। ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারটা অবশ্য আমি নিজেই ভাল জানি না—এবং গাছটাও আমার কথা শুনে বৈদ্যুতিক মোটর সম্পর্কে বিশেষ কিছু বুঝেছে—এমনটা অবশ্য আমারও কল্পনায় ছিল না। আমার বক্তৃতা শেষ হবার পরেই গাছটা কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে মোটরের কলকব্জাগুলো ঝট্‌পট্‌ খুলে ফেললো, আর পরক্ষণেই নিপুণভাবে জুড়ে দিলো তা। সুইচ্‌ দিয়ে দেখলাম—দিব্যি চলছে মোটরটা।

এরপর আমার অতিথিকে একটা অপেক্ষাকৃত সোজা কাজ

শেখানোর কথা ভাবলাম আমি। বাগানে কাঠের তক্তা পড়েছিল—সেগুলো দেখেই হঠাৎ আমার মাথায় আইডিয়া এল, ঐ তক্তাগুলো দিয়ে তো পাখীর খাঁচা বানানো যায়। খাঁচার মাপে তক্তাগুলোকে করাত দিয়ে কাটতে বসলাম আমি। গাছটা শান্ত হয়ে আমার কাজ দেখছিল ; কেন জানিনা আমার মনে হলো—গাছটার দৃষ্টিটা যেন ভারি বিষণ্ণ। ওর চোখে এইরকম বিষণ্ণ দৃষ্টি দেখেছিলাম আর একদিন—যেদিন ওর সামনে আমি ফুল তুলছিলাম আমার বাগান থেকে। সেদিনও এমন করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল ও। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন মনে হলো—আমার অতিথি ভিন্‌গ্রহের প্রাণী হলেও এখানকার গাছপালারা তো ওরই স্বজাতি। সেই গাছ থেকে তক্তা বানাতে কিংবা ফুল ছিঁড়তে দেখলে ওর তো কষ্ট হবেই। ও তো দেখছে—পৃথিবী নামের গ্রহটিতে আমরা মানুষরা বনের গাছপালা কেটে নষ্ট করছি, খাবার দাবার, পোষাক আসাক, আসবাবপত্র—সব তো আসছে ঐ গাছপালা থেকেই। আমাদেরই কি ভাল লাগবে যদি কোনও গ্রহে গিয়ে দেখি—সে গ্রহের অধিবাসীরা মানুষের মতো আকৃতির কোনও প্রাণীকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে !

এক একবার আমার মনে হতো—আমার অতিথিকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-বিজ্ঞানীদের কাছে যাই। কিন্তু আমি তো মুখ্যসুখ্য মফঃস্বলের মানুষ—রাজধানীর বিজ্ঞানীদের কাউকে চিনি না—কার কাছে নিয়ে যাবো সেটাই ভেবে ঠিক করতে পারিনি।

মাঝে মাঝে আমরা বাগানে চুপচাপ বসে থাকতাম। একদিন দেখি, আমার অতিথির সামনে একটা লতানে গাছ নেতিয়ে পড়ে রয়েছে। করুণ ভঙ্গীতে গাছটার দিকে তাকিয়েছিল ভিন্‌গ্রহের প্রাণীটি। আমারও ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল ; লতানে গাছটার জন্য আমারও কষ্ট হচ্ছিল খুব। একসময় হঠাৎ দেখি—মৃতপ্রায় লতানে গাছটা কেমন সতেজ সজীব হয়ে উঠেছে !

সত্যি বলছি, ব্যাপারটা নিয়ে তারপর আমি দিনরাত ভেবেছি। মৃতপ্রায় গাছটার জন্য যেই আমার মনে বেদনাবোধ জেগে উঠলো, অমনি শুধুমাত্র আমার সহানুভূতিটুকু পেয়েই গাছটা বেঁচে উঠলো—এটা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য ? একবার মনে হলো—ব্যাপারটা আবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত। আমার উঠোনের পাশেই রয়েছে একটা হলুদ গোলাপের গাছ। এমন রুগ্ন গাছ পৃথিবীতে আর একটা আছে কি না সন্দেহ। ক'বছর ধরে গাছটার পরিচর্যা কম করা হয়নি।

কিন্তু হলে কী হবে—গাছটার যেন বেঁচে থাকবারই উৎসাহ নেই ; কখনও ভাল করে ফুল পর্যন্ত ফোটে নি ওতে। আগের ঘটনার দিন চার পাঁচ পরে আমার অতিথিকে এড়িয়ে দাঁড়ালাম গোলাপ গাছটার সামনে। হতশ্রী চেহারার গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকাটাই এক বিড়ম্বনা, তা সত্ত্বেও মনে মনে আমি গাছটার প্রতি দয়ালু হতে চাইলাম, ওটা আর পাঁচটা গাছের মতো সতেজ হয়ে উঠুক সেটাই কামনা করলাম। দিন সাতেক পর পর গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে ওর সমৃদ্ধি কামনা করতে করতে একসময় দেখি—কখন যেন গাছটার ফুল পাতা এমনকি কাঁটাওয়ালা ডালগুলোকেও মনেপ্রাণে ভালবেসে ফেলেছি। এরও দিন চার-পাঁচ পরে অনুভব করলাম—আস্তে আস্তে হলেও গোলাপ গাছটার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসছে। ক্রমে গাছের পাতাগুলো সব ঝরে গিয়ে নতুন পাতা গজালো—তেমন ঝকমকে স্বচ্ছ পাতা আর হয় না। তারপর সেই গাছে কুঁড়ি এলো ফুল ফুটলো চারদিক আলো করে।....

আমার অতিথির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ক্রমেই বাড়ছিল। যখন দুজনে মুখোমুখি বসে থাকতাম, এক-একসময় ওকে আমার গাছ বলে মনে হতো না। ভাবতাম—ও বুঝি পৃথিবীরই আর এক অঞ্চলের মানুষ—যার আবেগ অনুভূতি আমার মতোই—শুধু পরস্পরের ভাষাতে আমরা কথা বলতে পারি না।

শরতের মাসগুলো কেটে যাবার পর যখন হিমেল বাতাস বইতে শুরু করলো—অমনি হঠাৎ খেয়াল হলো শীত আসছে। অতিরিক্ত শীতে যদি আমার বন্ধু কাবু হয়ে পড়ে সেই চিন্তাই আমাকে ঘিরে ধরে। এই রকমই এক রাত্রে আমরা দুজনে বাড়ীর পেছনের উঠোনে বসে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক শুনছি—হাল্কা মহাকাশযানটা নজরে পড়লো আমার। বাগানের গাছগুলোর মাথায় নিঃশব্দে কখন যে নেমে এসেছে টেরই পাই নি। আস্তে আস্তে যানটা এসে নামলো বাগানের লাগোয়া ছোট্ট মাঠটায়। কেন জানি না—আমি কিন্তু একটুও অবাক হই নি। হয়তো অবচেতন মনে আমি আশা করতাম—ওর সঙ্গীরা নিশ্চয়ই ওর খোঁজে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে। মহাকাশযানের গা বেয়ে তিনটে গাছ নেমে এলো—আমার অতিথির স্বজাতি বলে চিনতে ওদের অসুবিধে হয় না। ওরা এগিয়ে আসছিল আমাদের দিকেই—আমার বন্ধুটি আমাকে এক বিশেষ ভঙ্গীতে আলতো করে জড়িয়ে রইলো। আমি বুঝলুম, ও আমাকে সুখ আর ভালবাসার কথা বলতে চাইছে। বাকী তিনটে গাছ ততক্ষণে আমার বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাতাসে পাতা নড়ার শব্দ হলো—আগাছার মতো দেখতে ভিন্‌গ্রহের বাসিন্দারা যে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে সেটা বুঝতে আমার কষ্ট হলো না। একটু পরেই ওরা সবাই মিলে ফিরলো আমার দিকে, শেষ বারের মত ডালপালা নুইয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ওরা ফিরে গেল ওদের যানের দিকে।

....আমার অতিথি চলে গেছে অনেকক্ষণ। ভিন্‌গ্রহের অতিথি আমায় শিখিয়ে গেছে—আবেগ অনুভূতি অভিমান ভালবাসা—সব কিছুর দিক থেকে আমাদের সঙ্গে গাছপালার কত মিল!

সেই নীল বোতলটা

রে ব্র্যাডবারী

সূর্যঘাড়িগুলি সাদা নুড়িতে ঢাকা। যেসব এবড়ো-খেবড়ো পাথরের চাঁই-এর গায়ে একদিন বাতাস ডানা ঝাপটাতো—সেগুলো এখন মুখ গুঁজে পড়ে আছে বালির বুকে। ঐ বালির ওপর দিয়ে একদিন সাগরের জল বয়ে যেতো—সে সাগর আজ শুকনো—খট্‌খটে। প্রাচীন শহরগুলি চাপা পড়ে আছে বালি আর পাথরের নিচে। মঙ্গলগ্রহ এখন মৃত!

চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙে একটা ক্ষীণ যান্ত্রিক শব্দ এগিয়ে আসে। পুরনো আমলের একটা স্থলযান। তার মধ্যে বসে থাকতে দেখা যায় অ্যালবার্ট বেক এবং লিওনার্ড ক্রেগকে।

—হ্যালো!

অ্যালবার্ট ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে,—ঈশ্বরের দোহাই, অমনভাবে চেঁচিও না। শহরটার যেটুকু এখনও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তোমার চ্যাঁচানির ধাক্কায় সেটুকুরও আর মাটিতে মিশতে দেরি হবে না। আর তাহলে আমাদের অ্যাদ্দুর আসাটাই পণ্ডশ্রম হবে কিনা বলো?

আবার খানিকটা নিস্তব্ধতা। শেষে অ্যালবার্টই মুখ খোলে।

—চলো, এবারে আস্তে আস্তে বাড়িগুলোর ভেতরে ঢোকা যাক।

তুমি তাহলে সত্যি সত্যিই ঐ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঢুকতে চাইছো?—লিওনার্ড বিরক্তিতে মুখ বেঁকায়ঃ আর তাও কিনা সামান্য একটা বোতলের জন্যে? সত্যি কী যে আছে ওতে—কেন যে ঐ হতচ্ছাড়া বোতলটাকে হাতানোর জন্যে সবাই এমন পাগল?

অ্যালবার্ট সন্তর্পনে গাড়ী থেকে নেমে আসে; তারপর প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে,—কে জানে, কোন্‌ আদ্যিকালে মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দারা ঐ নীল বোতলটাকে বানিয়েছিল! তারপর আজ অবধি কত লোকের হাতেই না ওটা এসেছে, আবার হাতছাড়াও হয়েছে। আশ্চর্যের কথা, যারা বোতলটা পেয়েছিল তারা কিন্তু কেউ বলে যায়নি—কী ছিল তার মধ্যে!

তবুও তো পাগলের মত খুঁজে চলেছো। মঙ্গলের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত, কোথায় না গ্যাছো!—লিওনার্ডের কথাগুলো রীতিমত ঝাঁঝালো।

অ্যালবার্ট হাসে,—আরে ঐ বোতলের মধ্যে সত্যিই যে কী আছে তা কেউ জানে না বলেই না ওটা পাবার জন্যে সকলের এমন আকুতি--

কিন্তু সত্যি বলছি, তোমার এই পাগলামি আমার আর একটুও ভাল লাগছে না।—বিরক্তিতে ফেটে পড়ে লিওনার্ড।

বেশ, বেশ, তুমি নাহয় গাড়িতেই বসো।—লিওনার্ডকে যেন এড়িয়ে যেতে চায় অ্যালবার্টঃ এই বাড়ীগুলো আমি একাই ঘুরে দেখছি।....

মিনিট পনের পর দুজনকেই দেখা যায় সামনের বড় বাড়ীটার ভেতরে।

অ্যালবার্ট বললো,—একটা সুন্দর গন্ধ পাছো? খুব ভাল জাতের হুইস্কি কিংবা ব্রান্ডি—

লিওনার্ড মুচকি হেসে বলে,—ঘরে ঢোকার মুখে দেওয়ালের ধারে একটা বোতলের মধ্যে ছিল। এক ঢোকে পুরোটা সাবাড় করেছি।

অ্যালবার্ট চমকে ওঠে—বোতলের রঙ্‌টা খেয়াল করেছিলে?

আধো-অন্ধকারে কি আর রঙ্‌ চেনা যায়?—লিওনার্ড বলেঃ দরজার পাশেই তো পড়ে রয়েছে খালি বোতলটা—দ্যাখো না গিয়ে।

*　　*　　*

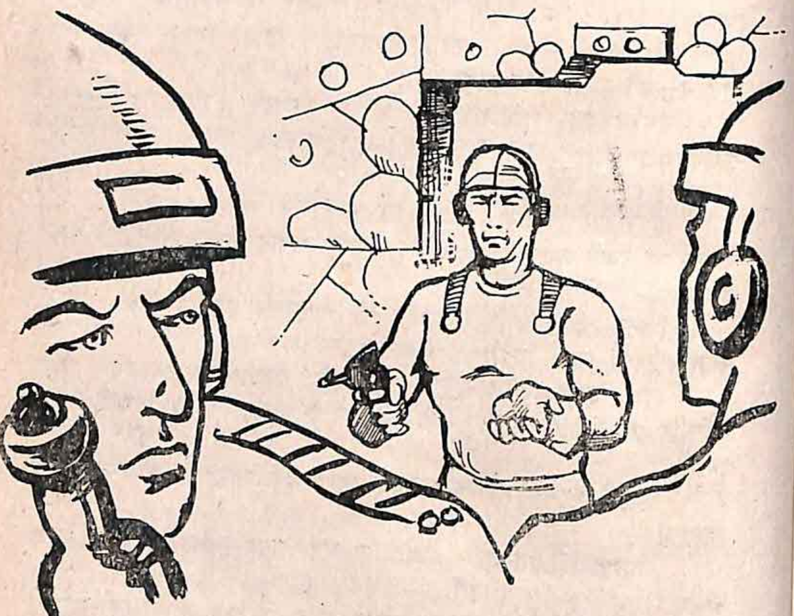
নীল রঙের কাঁচের বোতল। ঘরের বাইরে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে বোতলটাকে খুব সাবধানে হাতে নেয় অ্যালবার্ট।

আরে এটা তো বেশ ভারী দেখছি।—অ্যালবার্ট বলে ওঠে।

—ধ্যাৎ, তা কি করে হবে ? আমি তো পুরো বোতলটাই খালি করে দিয়েছিলাম—দাও তো দেখি।

বোতলটা হাতে নিয়ে আবার গলায় উপুড় করে, লিওনার্ড। গলা দিয়ে পানীয় নেমে যাওয়ার ঢক্‌ঢক্‌ শব্দ, চারপাশে মৃদু সুগন্ধ—

আশ্চর্য ! খালি বোতলটা আপনা আপনি আবার ভরে গেল কি করে ?—অ্যালবার্টের দিকে বোতলটা এগিয়ে দেয় ও।



তুমি কি এখনও বুঝতে পারনি, এই বোতলটাই আমরা অ্যাদ্দিন ধরে খুঁজে বেড়িয়েছি ?—পরম যত্নে বোতলটার গায়ে হাত বুলোতে থাকে অ্যালবার্ট। আর ঠিক তখনই যেন কার পায়ের শব্দ কানে আসে।

—মশাইরা, এদিকে একটু দেখবেন ?

চমকে ওঠে দুজনেই পেছন ফেরে। ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ষণ্ডা চেহারার একটা লোক—কুৎকুতে চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। লোকটার হাতে-ধরা অস্ত্রটা দুজনেরই অচেনা।

আমায় ক্ষমা করবেন,—অচেনা মানুষটির গলায় মৃদু হাসি ঃ আসলে এসব বন্দুক-টন্দুক ধরতে আমার একটুও ভাল লাগে না। নেহাৎ আপনাদের হাতের ঐ বোতলটা আমার না পেলেই নয়। ওটাকে অনেকদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি কিনা—

অ্যালবার্টের মনটা ভারী হয়ে ওঠে। বোতলটা হাতে এলো, অথচ তার রহস্যটুকু জানতে পারার আগেই তা খোয়াতে হচ্ছে! কিন্তু উপায়ই বা কী? আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে বোতলটা ও এগিয়ে দেয় আগন্তুকের দিকে।

সত্যি, এত সহজে যে কাজটা হাসিল হবে, ভাবতেই পারিনি তা।—অ্যালবার্টের হাত থেকে বোতলটা নেওয়ার সময় বিড়বিড় করে বলে ওঠে লোকটা। তারপর নিমেষের মধ্যে ফটকের বাইরে উধাও হয়ে যায়।

* * *

মাঝরাতে জঙ্গলের জোড়া-চাঁদের আবছা আলোয় পুরনো-জীর্ণ শহরটাকে ধুলোবালির ঢিপির মতো দেখায়। ক্ষতবিক্ষত রাস্তা ধরে গাড়িটাকে সন্তর্পণে চালাতে চালাতে লিওনার্ড ক্রেগ বলে,—লোকটা যখন সাইকেলে চেপে পালালো তখনই জানি, ওর আর টিকি ছুঁতে পারছি না আমরা।

দাঁড়াও তো হে। রাস্তার ধারে কী যেন একটা দেখলাম বলে মনে হলো।—অ্যালবার্ট বন্ধুর পিঠে চাপড় মারে।

লিওনার্ড গাড়ি পিছিয়ে আনে। অ্যালবার্টের টর্চের তীক্ষ্ণ আলো এসে পড়ে রাস্তার ধারে ঝোপঝাড়ের গায়ে।

অল্প দূরে ছোট একটা খাদের মধ্যে সাইকেল-আরোহীর দেখা মেলে। সাইকেলটা পড়ে আছে মাটিতে, পাশেই শুয়ে আছে লোকটা ; চোখ দুটো খোলা। টর্চের আলো পড়ার পরেও সে চোখের মণি অনড়-নিশ্চল।

লিওনার্ডই প্রথম এগিয়ে যায় লোকটার দিকে।

—অনেকক্ষণ আগেই তো মারা গেছে দেখছি। তা বোতলটা গেল কোথায় বলো তো?

অ্যালবার্টকে বেশ চিন্তিত দেখায়। চারপাশের জমির ওপর টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে বলে,—আশ্চর্য। বোতলটা উধাও! লোকটা মারা গেছে, অথচ গায়ে একফোঁটা আঘাতের চিহ্ন নেই!

লোকটাকে মারলো কে?—লিওনার্ড প্রশ্ন করে।

—বুঝতে পারছি না।

দ্যাখো, দ্যাখো—দূরে ঐ মাঠের ওপর দিয়ে কারা যেন ছুটে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না?—লিওনার্ড আঙুল তুলে দেখায়।

'সত্যিই তো!' অ্যালবার্টও দেখতে পায়।

ঠিক তক্ষুণি পেছন থেকে একটা চিড়্‌বিড়্‌ শব্দ কানে আসে। অবাক হয়ে ওরা দেখে—মৃত লোকটার শরীর থেকে আলোর আভা ফুটে বেরুচ্ছে! মাথার চুলগুলো খাড়া; চিড়্‌বিড়্‌ আওয়াজটা আসছে ওখান থেকেই। পট্‌কা ফাটলে যেমনটা শুনতে লাগে।.... কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গোটা মৃতদেহটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়! শরীরটা যেন গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে হাল্কা ধুলোর মতো মিলিয়ে যায় বাতাসে!

এ নিশ্চয়ই ঐ শয়তানগুলোর কীর্তি। নতুন ধরনের কোন অস্ত্রটস্ত্র বোধহয় হাতিয়েছে ওরা!—উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে লিওনার্ড।

অ্যালবার্টের দৃষ্টি উদাস। বলে,—বোতলটা সম্পর্কে শুনেছিলাম—ওটা নাকি এর আগে যাদেরই হাতে গেছে তারা সবাই অল্পদিনের মধ্যে একেবারে উবে গেছে।

গাড়ির দিকে এগোতে থাকে অ্যালবার্ট। চোখেমুখে দৃঢ় প্রত্যয়।

—কী করতে চাইছো, বলতো?

গাড়িতে লোকগুলোকে ধাওয়া করা ছাড়া আর রাস্তা নেই।—শান্ত গলায় জবাব দেয় অ্যালবার্ট।

এই এবড়ো খেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে তুমি গাড়ি চালাবে?—লিওনার্ডের চোখ কপালে ওঠেঃ যাক্‌গে, তুমি তোমার বোতলের পেছনে ছোটো। আমি বাবা আর এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি না।

বেশ, আমি একাই যাচ্ছি।—চকিতে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেয় অ্যালবার্টঃ তুমি এখানেই দাঁড়াও। আমি বোতলটা নিয়ে ফিরে আসছি।

চারদিকটা যেন বড় বেশী ঠাণ্ডা। গাড়ির ইঞ্জিনটা বন্ধ করতে গিয়ে অ্যালবার্টের হঠাৎ যেন মনে হয়, দূরে বালিয়াড়িতে তিনটে ছায়ামূর্তি একেবারে স্থির নিশ্চল।

অ্যালবার্ট চুপিসাড়ে এগিয়ে চলে ছায়াগুলোর দিকে। এ লোকগুলোও শুয়ে আছে পাশাপাশি। একটু দূরেই পড়ে আছে সেই বোতলটা।

পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে বোতলটাকে হাতে নেয় অ্যালবার্ট। ঠিক তক্ষুণি এক বিকট আওয়াজ করে মৃতদেহ তিনটি ছিটকে যায় বাতাসে। তারপর সেই শরীর ধুলোর মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বাতাসে মিশতে থাকে—ঠিক যেমনটা অ্যালবার্ট দেখে এসেছে একটু আগেই।

'কোন নতুন ধরনের অস্ত্র'—লিওনার্ডের কথাগুলো ওর কানে বাজতে থাকে। উঁহু, নতুন কোন অস্ত্র নয়—আসলে লোকগুলোর অকাল মৃত্যুর জন্যে যে ঐ বোতলটাই দায়ী তা বুঝতে আর কষ্ট হয় না অ্যালবার্টের। সঙ্গে সঙ্গে কত না প্রশ্ন এসে ভিড় করতে থাকে মনের মধ্যে। তাহলে, ঐসব অসুখী-অতৃপ্ত মানুষগুলি কি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাতেই দিন গুনছিল? গত হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ কি শুধুমাত্র মৃত্যুর কামনায় এ বোতলের পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছে? সব মানুষের মনেই কি তাহলে মৃত্যুর জন্যে একটা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে?

না সবার নয়। অ্যালবার্ট বেশ বুঝতে পারে। আসলে, এই দুনিয়ায় আবার লিওনার্ড ক্রেগের মতো লোকও রয়েছে—যারা কোন কিছুতেই তেমন বিস্মিত হয় না, বিচলিত হয় না।

অ্যালবার্ট বোতল ঝাঁকায়। পরম পরিতৃপ্তিতে ওটাকে চেপে ধরে বুকের মধ্যে। ওর মনে হয়—এতদিনের সব ক্লান্তি যেন নিমেষে দূর হয়ে যাচ্ছে!

জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের সুখের সান্নিধ্য পায় ও। ঠিক তখনই ওর হাত থেকে বোতলটা গড়িয়ে পড়ে মাটিতে।

* * *

ভোরের আলো আকাশে ফুটতেই রাস্তা থেকে মাঠে নেমে আসে লিওনার্ড। আশ্চর্য, সারা রাতের মধ্যেও ফিরলো না অ্যালবার্ট! বোতলটার জন্যে লোকটা সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেল নাকি?

খানিক এগোতেই মাঠের ওপর বোতলটাকে রোদের আলোয় চক্‌চক্‌ করতে দেখা যায়। এগিয়ে গিয়ে হাতে তুলে নেয় লিওনার্ড। সুগন্ধী পানীয়তে আবার দিব্যি ভর্তি হয়ে গেছে ওটা।

অ্যালবার্ট, কোথায় তুমি? শিগ্‌গির এসো।—তারস্বরে চেঁচাতে থাকে লিওনার্ড ঃ এই দ্যাখো তোমার প্রিয় বোতল।

না, চারদিক নিস্তব্ধ। যদ্দূর দৃষ্টি চলে—অ্যালবার্টের কোন চিহ্ন নেই।

সত্যি, কোথায় যে গেল হতচ্ছাড়াটা ?—পাথরের ওপর বসে দুপাশে পা ছড়িয়ে দেয় লিওনার্ড ঃ কতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করতে হবে কে জানে ?

বলেই গলার মধ্যে বোতলটাকে আবার আগের মতো উপুড় করে ধরে ও।

জঞ্জাল

ভ্লাদিমীর গ্রীগরিয়েভ

মস্কোর পুরনো এক গলির মোড়ে ময়লা ফেলার ডাস্টবিনের পাশে জরাজীর্ণ কাঠের ফলকটা কারো কারো চোখে পড়ে থাকবে। ফলকটার গায়ে আবছা হয়ে আসা একটা ছবি—তাতে গ্রামোফোনের চোঙের মতো দেখতে এক প্রকাণ্ড শিঙার সরু মুখে বেল্‌চা দিয়ে আবর্জনা ঢোকাচ্ছে একজন ছোট্ট-খাট্টো মানুষ, আর শিঙার অন্যমুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে টুকিটাকি নানা কাজের জিনিষ। গরম পোশাক, পাউরুটি-বিস্কুট, ছুরির ফলা, দুধ-ভর্তি বোতল—মায় আস্ত একটা হারমোনিয়ামও নজরে আসে। পাড়ার লোকজন যাতে তাদের বাড়ী-ঘরের আবর্জনা এনে ঐ ডাস্টবিনের মধ্যে নিয়মিত ফেলে তা বোঝাতে ঐ ছবির পাশে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—

এইখানে সব্বাই,
জঞ্জাল আনো ভাই !

ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে চলতে মায়েরা ঐ ছবির তামাটে রঙের চোঙ্‌টা দেখিয়ে বলতো, ''ম্যাজিক-চোঙটা দেখে নাও যা চাইবে তাই পাবে ওর কাছ থেকে....'' বাচ্চারাও আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠতো।

তা, এসব অবশ্য পুরনো দিনের কথা। দু-চারটে শীত কাটতে না কাটতেই শিঙার রঙ বিবর্ণ হয়ে গেছে। বেঁটে-খাটো যে লোকটা বেল্‌চা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো শিঙাটার সরু প্রান্তে—ইতিমধ্যে তার বেল্‌চা উধাও। কাঠের ফলকের অবস্থাও রীতিমতো নড়বড়ে। পথ-চলতি লোকেরা এখন আর ফিরেও তাকায় না ছবিটার দিকে। বলতে

গেলে, গলির মুখে পুলিস-চৌকির ওপর থেকে পেত্রোভের-ই যা একটু নজর পড়ে ওটার দিকে। একজায়গায় টানা পনেরো বছর ধরে ট্র্যাফিক-পুলিসের ডিউটি করছে পেত্রোভ। চোখ বুজলেও, এজায়গার প্রতিটা ইঁট-কাঠের চেহারা যেন ওর চোখের সামনে ভাসে—

ব্যতিক্রম ঘটলো একদিন। শীতের এক সন্ধ্যেয় গলির মোড় থেকে থেকে পেত্রোভ দেখলো—হাঁটু অবধি ঢাকা পশমের কোট গায়ে, মাঝবয়েসী, খ্যাপাটে চেহারার বেঁটে-খাটো একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে ছবিটার সামনে ; কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিবিষ্ট মনে কী যে দেখে চলেছে সেই জানে।

লোকটার নাম স্তেপান অগরুৎসভ। হাবভাবে একটু খ্যাপাটে হলেও পাড়ার লোকে একডাকে চেনে ওকে। না চিনেই বা উপায় কি ? যে কোন জিনিস মেরামতির কাজে লোকটার অসাধারণ দক্ষতা। ঘড়ি, রেডিও, টর্চ, তালা কিংবা সেলাইকল অকেজো হলেই স্তেপানের খোঁজ পড়ে। এমন কি এক প্রতিবেশীর পুরনো ঝরঝরে টেলিভিসন সেট-টা এমনভাবে সারিয়েছে যে পাড়ার লোকেরা তাতে সিনেমা দেখতে ভিড় করে ! স্তেপানের হাতে একবার যে জিনিষ পড়েছে, সারাই-এর পর তা যে বহুদিন আর বিগড়োবে না তা নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে সবাই।

বাড়ীওয়ালার ছোট্ট মেয়েটাকে একবার একটা মজার পুতুল বানিয়ে দিয়েছিল স্তেপান। পুতুলটা যে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটতো আর মুখ দিয়ে শব্দ করতো তাই নয়, রাত্তির ঠিক আটটায় চোখ বুজে দড়াম করে শুয়ে পড়তো ; সে চোখ খুলতো ঠিক বারো ঘন্টা পরে। বন্ধুবান্ধবদের পুতুলটা দেখিয়ে খুশী খুশী মুখে বাড়ী-ওয়ালা বলতো,—আমাদের আর এখন অ্যালার্ম-ঘড়ির দরকার হয় না হে—।

ট্রাফিক পুলিশ পেত্রোভের অবশ্য এসব কিছুই জানা ছিল না। আর তাই স্তেপান অগরুৎসভ-কে ডাস্টবিনের সামনে নিবিষ্টমনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর মনে সন্দেহ জাগাটাই স্বাভাবিক। অমন করে কী দেখছে লোকটা ? এমন কী ছবি যে তার দিকে তাকিয়ে একেবারে আত্মভোলা হয়ে যেতে হবে ! মতলব কী লোকটার ?

পরের দিন আবার এলো স্তেপান। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ছবিটার সামনে। পেত্রোভও লক্ষ্য করলো, লোকটা নিজের মনে কি সব যেন বিড়বিড় করে বলছে আর একটা বাঁধানো খাতায় আঁকিবুঁকি কাটছে ! এদিকে পেত্রোভ পড়েছে মহাফাঁপরে। লোকটার আচরণ এমন

কিছু অসঙ্গত নয় যে তাকে গিয়ে পুলিশী জেরা করে, অন্যদিকে কৌতূহল চাপতে না পেরে প্রাণ আঁইটাঁই।

তা দিন কয়েকের মধ্যে পেত্রোভ কেন, আশপাশের লোকজনের কারোরই জানতে বাকী রইলো না যে, মস্কোর সেরা মেকানিক স্তেপানের মাথায় ঐ ছবির মতো সত্যিকারের এক শিঙা বানানোর খেয়াল চেপেছে। জিনিষপত্র মেরামতের কাজে স্তেপানকে আর পাওয়া যায় না। সকাল-বিকেল নিয়ম করে ও এখন ছবিটার সামনে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিটাকে দেখে আর তারপর বাড়ী ফিরে, ঐ ছবিরই নক্সা মতো শিঙার মতো দেখতে পেল্লায় এক যন্ত্র বানানোয় লেগে পড়ে। প্রতিবেশীরা পরস্পরকে বলে,—ওহে শুনেছো, আমাদের স্তেপান আবার আবিষ্কারের নেশায় মেতেছে।

অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ সেরে এক একদিন স্তেপান মনের স্ফূর্তিতে শিস্ দিতে দিতে বা গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে নিজের ডেরার দিকে হাঁটা দেয়। পেত্রোভ কান খাড়া করে গানের লাইনগুলো শোনার চেষ্টা করেছে। উদ্ভট সব কথা—বিদ্যুৎ-বর্তনী/চুম্বক/চোঙের গায়ে তামার প্রলেপ/চমৎকার! চমৎকার! আবার এক একদিন একেবারে উল্টো দৃশ্য। লোকটা এসে বিমর্ষমুখে দাঁড়িয়ে থাকে ছবিটার সামনে। মাথাটা ঝুঁকে থাকে। একেবারে হতাশায় ভেঙে পড়া একটা মূর্তি!

কিন্তু না, ভেঙে পড়ার পাত্র নয় স্তেপান। কোন কাজ শুরু করে তার শেষটা না দেখে ছাড়ার পাত্র নয় সে। সমস্ত কাজ কারবার মাথায় উঠেছে, ছবিতে আঁকা যন্ত্রটাই এখন ওর ধ্যান-জ্ঞান! টুক্‌টাক্ মেরামতীর কাজ নিয়ে পড়শীদের আসা-যাওয়া বন্ধ ; বাড়ীতে সর্বক্ষণ এক পেল্লায় তামার চোঙ নিয়ে মেতে আছে স্তেপান। কতবার যে সেই চোঙের চেহারা বদলেছে, আর চোঙের গায়ে লাগানো হয়েছে কত বিচিত্র সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি। ফাঁকে ফাঁকে চলছে অঙ্ক কষা আর ছবির নক্সার খসড়া। স্তেপানের দৃঢ় বিশ্বাস—অঙ্কের ভুলচুকগুলো শুধরে নিলে আর শিঙার নক্সাটা ঠিকঠাক হলে ডার্স্টবনের ধারে কাঠের ফলকের গায়ে আঁকা সেই ছবিটাই বাস্তব রূপ নেবে। ছবিটা যে নেহাৎ-ই এক অনামী চিত্রকরের উদ্ভট কল্পনার স্বাক্ষর নয় তা প্রমাণ করবে সে।

স্বপ্ন সাধারণতঃ সফল হয় না, কিন্তু স্তেপানের বরাতে সেই বিরল ঘটনাই ঘটলো। একদিন চোঙের ভেতরকার তড়িৎবর্তনী আর চুম্বকের কার্যকারিতা যাচাই-এর উদ্দেশ্যে সুইচ্‌গুলিকে নাড়ানাড়ি

করতে গিয়েই অঘটন ঘটলো বলা যায়। শিঙাটার চক্‌চকে গা দিয়ে প্রথমে আগুনের ফুল্‌কি ছিটকে বেরলো আর তারপরই সাতরঙা আলোয় ভরে গেল গোটা ঘরটা ! খানিকক্ষণ পরে নিজের তৈরী যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে স্তেপান দেখলো—শিঙার একদিকের মুখ দিয়ে আবর্জনা আর ভাঙাচোরা জিনিষপত্র ঢুকিয়ে দিলে অন্য মুখ দিয়ে তা বেরিয়ে আসছে ঝকঝকে চেহারা নিয়ে ! একবার নয়, দুবার নয় —বারবার ! সুতরাং স্তেপানকে এক ভাঁজ-ভাঙ্গা কোট-প্যান্ট পরতে হলো ; জুতোয় কালি লাগিয়ে আর দাড়ি কামিয়ে হাজির হতে হলো সরকারী পেটেন্ট অফিসে।

স্তেপানের ধারণা ছিল, সরকারী অফিসাররা বিশেষ কাজের হয় না। কিন্তু তার সেই ধারণাটাই পাল্টে গেল মলোক্‌টভ-কে দেখে। ছোক্‌রা অফিসার—অফিসে কাজ করছিল রাশভারি ভঙ্গীতে।

আমার একটা আবিষ্কারের বিষয় জানাতে এসেছিলাম।—আমতা আমতা করে বলে উঠেছিল স্তেপান।

মলোক্‌টভ কিন্তু যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে স্তেপানের যন্ত্রটা সম্পর্কে খুঁটিনাটি জেনে নিলো। তারপর টেলিফোনে সেক্রেটারীকে ডেকে সেদিনের সব মিটিংগুলো ঘন্টা কয়েক পিছিয়ে দিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে সটান চলে এলো স্তেপানের ডেরায়। পাকা মিস্ত্রীর মতো যন্ত্রটা দেখতে লাগলো মলোক্‌টভ, সেই সঙ্গে প্রশ্নের পর প্রশ্ন : তড়িৎ-বর্তনীকে ঠিকমতো আর্থ করা হয়েছে তো ? চুম্বকের সঙ্গে তারটা ঐভাবে জোড়া হয়েছে কেন ? যন্ত্রের কার্যকারিতা কতো ? ইত্যাদি ইত্যাদি। পাশে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে দিতে স্তেপানের হঠাৎ মনে হলো—এরপর হয়তো মলোক্‌টভ মেশিনটা চালিয়ে দেখাতে বলবে। অথচ, এখন এমনই অবস্থা—ঘরে শুধু নতুন জিনিষের রাশি ; একটুকরো আবর্জনা কোথাও পড়ে নেই।

হাতের কাছে আবর্জনা না থাকলেও আবর্জনা পেতে কতক্ষণ ! শিঙার মুখ থেকে যেসব কাজের জিনিষ বেরিয়ে এসেছে সেগুলিকেই আবার ওর পেটের মধ্যে চালান করে যন্ত্রের হাতলটা উল্টোদিকে ঘোরালেই হলো....। কথাটা ভাবতেই হাসি পেল স্তেপানের। আরে আস্ত জিনিষ ভাঙতে কি আর যন্ত্রের কোন প্রয়োজন হয় ?

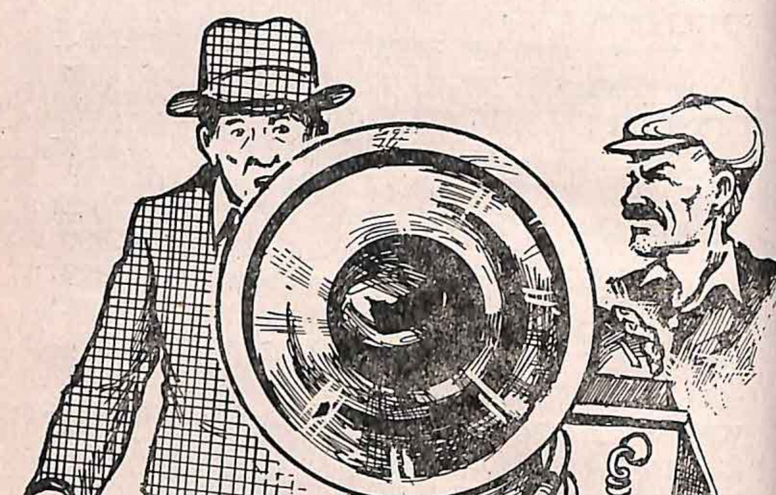
স্তেপানের সংবিত ফিরলো মলোক্‌টভের ডাকে।

—আমার অভিনন্দন নিন মিস্টার অগ্রুৎসভ্‌। আপনার এই আবিষ্কার নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী ঘটনা। আমি ব্যবস্থা করছি যাতে আপনি জনসাধারণের সামনে এই যন্ত্রটার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা

হাতে-কলমে করে দেখাতে পারেন। আবর্জনার জন্য চিন্তা নেই। আমাদের কর্পোরেশনকে বলে এক গাড়ী আবর্জনার ব্যবস্থা রাখবো সেদিন।

লোকটার উচ্ছ্বাস দেখে স্তেপানেরই কেমন যেন লজ্জা করছিল সেদিন।

মলোক্টভ বিদায় নিতেই দরজায় হুড়কো টেনে বাইরে বেরিয়ে এলো স্তেপান। মনে মনে ভাবলো ঃ আজ অন্ততঃ একবার ডাস্টবিনের



ধারে ঐ ফলকটার কাছে যাওয়া উচিত। ওটা চোখে না পড়লে যন্ত্র বানানোর আইডিয়াটাই হয়তো কোনদিন আসতো না মাথায়—

গলির মুখটায় ফলকটার কাছে এসে এই প্রথম চারদিকে চোখ বোলালো স্তেপান। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। গুটি গুটি পায়ে স্তেপান এসে দাঁড়ালো প্রহরারত পেত্রোভের সামনে।

—আসুন সার্জেন্ট, একটা সিগারেট খাওয়া যাক। আজকের দিনটা আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ আনন্দের দিন। ঐ যে ফলকটা দেখছেন

ঐরকম একটা শিঙা তৈরী করেছি আমি। সেটা কিন্তু সত্যি সত্যিই আবর্জনা থেকে নানারকম দরকারী জিনিষ তৈরী করতে পারে।

প্রথম দিনই আপনাকে দেখে বিজ্ঞানী বলে মনে হয়েছিল।—সমঝদারের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়লেন পেত্রোভ ঃ 'বিজ্ঞানীদের মাথা থেকে কতসব আজব জিনিষই না বেরোয় ! তা, কাজ যখন শেষ হয়েছে তখন কি এদিকে আর আসবেন ?

স্তেপান বললো,—আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব ভাল লাগলো। হয়তো আমাদের আর কোনদিন দেখা হবে না, তবু আমার আনন্দের প্রথম ভাগীদার হলেন আপনি। আচ্ছা, চলি তাহলে—!

পেত্রোভ কিংবা স্তেপান কেউই কিন্তু ভাবতেও পারেনি, তাদের দুজনের আবার দেখা হবে খুব শীঘ্র—এক অবিশ্বাস্য পরিস্থিতিতে !

* * *

দিনটা ছিল শরতের এক দুপুর। বৃষ্টিধোয়া নীল আকাশের নীচে—শহরের ঠিক বাইরে এক খোলা মাঠে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। খবরটাও চাপা থাকেনি। কারিগর অগ্রুৎসভ্ নাকি এমন এক যন্ত্র বানিয়েছে যা ভাঙাচোরা আবর্জনা থেকে নতুন করে সব কাজের জিনিস তৈরী করে ! সেই আজব যন্ত্রের কেরামতি দেখতে সকাল থেকেই শয়ে শয়ে লোক এসে ভিড় জমিয়েছে মাঠটাকে ঘিরে।

সত্যি নিজের চোখে না দেখলে স্তেপানও বিশ্বাস করতে পারতো না—তার আবিষ্কারকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন পেটেন্ট বিভাগের কর্তারা। মাঠের মাঝখানে সাজানো-গোছানো মঞ্চ, তার ওপরে বসানো হয়েছে তার এতদিনের সাধনার ফসল—অত্যাশ্চর্য যন্ত্রটা ; মঞ্চের পাশেই একগাড়ী জঞ্জাল—নাঃ আয়োজনের কোন খুঁৎ নেই।

হঠাৎ স্তেপানের চোখ পড়ে সার্জেন্ট পেত্রোভের দিকে,—আরে সার্জেন্ট, আপনি এখানে যে ?

একেই বলে যোগাযোগ—।—করমর্দনের উদ্দেশ্যে স্তেপানের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় পেত্রোভ ঃ স্পেশাল ডিউটি পড়েছে আজ এখানে। এতো লোকের ভিড়, বলা যায় না—গন্ডগোল বাধতে কতক্ষণ ! অবশ্য আমি যখন আছি—

ইতিমধ্যে কর্মকর্তাদের একজন এগিয়ে আসেন,—মিস্টার অগ্রুৎসভ্—এবার তাহলে আপনার যন্ত্রের কার্যক্ষমতা যাচাই করা যাক্ —কী বলেন ?

কিন্তু মাত্র একগাড়ী জঞ্জালে কী হবে ?—মঞ্চের দিকে এগোতে এগোতে বলে ওঠে স্তেপান।

—বলেন কী ? আরও জঞ্জাল চাই ?

—অবশ্যই।

কতটা দরকার ?—ভদ্রলোক রীতিমতো অবাক।

অন্ততঃ গাড়ী দশেক তো বটেই।—নির্বিকার মুখে উত্তর দেয় স্তেপান ঃ আসলে ব্যাপারটা শুরু হলে তো সেটা চলতেই থাকবে। বিশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ—যত গাড়ী জঞ্জাল আপনার ইচ্ছে হয় ঢালুন না !

—বেশ, আপনার যন্ত্রটা একবার চালু করুন তো, শহরের সমস্ত জঞ্জাল এনে ফেলবো এই মাঠে।

শুরুতে পেটেন্ট অফিসের সেই ছোকরা-অফিসার মলোক্‌টভের সংক্ষিপ্ত ভাষণ। মঞ্চের ওপরে রাখা অদ্ভুত-দর্শন যন্ত্রটার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে দু-চারকথা বলেই ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দেন স্তেপানের দিকে। স্তেপানকে মঞ্চের মাঝখানে ধরে আনার সময় আবেগ-জড়ানো গলায় বলে ওঠেন,—এই যে মানুষটিকে দেখছেন—এঁর কারিগরী প্রতিভা আমাদের এমন এক যন্ত্র উপহার দিয়েছে যার দিকে আগামী শতকের মানুষও বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকবে। আসুন মিস্টার অগ্রুৎসভ্‌, এবারে আপনার যন্ত্রটা চালু করুন, এখানে জড়ো হওয়া লোকেদের কৌতূহল মেটান—!

দর্শকদের উদ্দাম করতালির মাঝে যন্ত্রের কাছে এগিয়ে গেল স্তেপান। প্রথমে শিঙার চারপাশে বৈদ্যুতিক কন্‌ট্যাক্টগুলি ঠিক জায়গায় আছে কিনা দেখে নিয়ে মুঠো করে খানিকটা আবর্জনা সরু মুখটা দিয়ে চালান করে দিলো ভেতরে। এরপর শিঙার পেটের কাছে হাতলটা ঘুরিয়ে দিতেই একটু একটু করে জঞ্জাল ঢুকতে লাগলো —যেন অদৃশ্য এক কন্‌ভেয়ার বেল্ট টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওগুলোকে !

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপরই শিঙার প্রকাণ্ড হাঁ-মুখটা দিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করলো টুকিটাকি সব কাজের জিনিষ। সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকদের উল্লাসে চাপা পড়ে গেল যন্ত্রের আওয়াজ।

—আরে ! উলের একজোড়া মোজা যে—!

—দ্যাখো, দ্যাখো, জলের কেট্‌লি ! আরিব্বাস !

জুতো, জামা, পেপারওয়েট, সিগারেট-প্যাকেট, দুধের বোতল, টিনের কৌটো, ছুরি-কাঁচি, ব্লেড, ব্যাটারী, গেলাস—মঞ্চের ওপর আন্‌কোরা জিনিষপত্রের যেন ছোটখাটো পাহাড় জমতে থাকে !

উপস্থিত জনতার উল্লাস বুঝি আর বাধা মানে না। স্তেপানের চোখ-দুটো খুশী আর কৃতজ্ঞতায় চক্‌চক্‌ করতে থাকে।

গোটা মাঠ যখন আনন্দে আর বিস্ময়ে উদ্বেল, একজন মানুষকে দেখা গেল পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল—অবিচলিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকতে। হাঁটু অবধি লম্বা একটা ওভারকোট গায়ে মানুষটি স্তেপানের যন্ত্র দেখছিল গভীর মনোযোগ দিয়ে। ওর নাম পারভোজভ্‌। লোকে বলে, পৃথিবীর কোন ঘটনাই পারভোজভ্‌-কে কখনো বিস্মিত করতে পারেনি। সবকিছুই নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করার এক অদ্ভুত ঝোঁক ওর। এর জন্যে লোকটার খ্যাতি-অখ্যাতি দুটোই সমান।

দয়া করে আপনারা একটু শান্ত হোন্‌।—হঠাৎ সকলের গলা ছাপিয়ে ভেসে উঠলো পারভোজভের গম্ভীর কণ্ঠ ঃ এই আবিষ্কারটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ নিয়ে এতো বেশী মাতামাতি করার আগে এই যন্ত্র সম্পর্কে কিছু খুঁটিনাটি তথ্য জেনে নেওয়া দরকার।

আরও খুঁটিনাটি ? যন্ত্রটা যে নিখুঁতভাবে কাজ করছে সেটা তো সবাই আমরা দেখতে পাচ্ছি।—ভিড়ের মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে কেউ কেউ।

শুধু কাজ করলেই হলো ?—মুখে একটা সবজান্তার হাসি ফুটিয়ে পারভোজভ্‌ এগিয়ে এল স্তেপানের মুখোমুখি ঃ আচ্ছা, মিস্টার অগ্রুৎসভ্‌ বলুন তো—আপনার এই শিঙা-যন্ত্র থেকে কী কী জিনিষ বেরোবে তা কি আগে থেকে জানা সম্ভব ? তাছাড়া জিনিষ-গুলোর ফর্দ বানানোর একটা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাও তো থাকা চাই।

না, মানে এ ব্যাপারটা আমি ভাবিনি।—লজ্জিতভাবে বলে ওঠে স্তেপান ঃ আসলে যন্ত্রটা বানাতেই এতোগুলো দিন কেটে গেল। তবে আপনি যখন বলছেন····

হ্যাঁ, অবশ্যই। এসব ব্যবস্থা তো রাখতেই হবে।—প্রায় উপদেশের ভঙ্গীতে কথা বলে পারভোজভ্‌ ঃ আর একটা প্রশ্ন—আপনার এই যন্ত্রটা যেন জঞ্জালকে টুকিটাকি কাজের জিনিষে রূপান্তরিত করে তেমনি এর উল্টোটাও কি সম্ভব ? মানে, এই যে দরকারী জিনিষ সব যন্ত্রের পেট থেকে বেরিয়ে এলো—এগুলিকে কে আবার আগের জঞ্জালের চেহারায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ?

—অবশ্যই। কিন্তু এ প্রশ্ন উঠছে কেন ? কেউ কি আর সাধ করে আনকোরা কাজের জিনিষকে জঞ্জালে রূপান্তরিত করতে চায় ?

—চাক্ বা না-চাক, আপনার যন্ত্রটা যে ঐ কাজটা পারে তা একবার চাক্ষুষ দেখতে অসুবিধে কোথায় ?

লোকটা কি উন্মাদ ?—মনে মনে ভাবে স্তেপান।

কর্মকর্তাদের একজন এগিয়ে আসে,—ইনি যখন চাইছেনই, তখন একবার নাহয় করেই দেখান না !

বেশ।—স্তেপান উল্টোদিকে যন্ত্রের হাতল ঘোরায়। শিঙার প্রকাণ্ড মুখটা দিয়ে একটু আগেই যেসব টুকিটাকি কাজের জিনিষগুলি এগিয়ে এসেছিল—এবার সেগুলিই গিয়ে ঢুকতে থাকে শিঙার মধ্যে। ঝড় উঠলে যেমন হয়, হঠাৎ এক দম্‌কা হাওয়া যেন জিনিষগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে যায় শিঙার মুখের মধ্যে।

পারভোজভ্ দাঁড়িয়েছিল মঞ্চের ওপরেই, হঠাৎ ওর মাথার টুপীটা উড়ে যায় শিঙার দিকে। প্রথমটা হতভম্ব হলেও, পরক্ষণেই পারভোজভ্ ঝাঁপিয়ে পড়ে টুপীটাকে ধরার জন্য।

টুপীর মায়া ছেড়ে সরে আসুন, সরে আসুন, বলে চেঁচাতে থাকে স্তেপান।

কিন্তু কে কার কথা শোনে ! স্তেপান দেখে—প্রচণ্ড ঘূর্ণীর টানে লোকটার হাত-মুখ ঢুকে গেছে শিঙার মুখে ! চিন্তা ভাবনার অবকাশ নেই—স্তেপান লাফিয়ে গিয়ে চেপে ধরলো পারভোজভের একটা পা। 'আপনারা কেউ দয়া করে হাতলটাকে চেপে ধরুন'—মঞ্চের ওপর দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মতো চিৎকার করতে থাকে স্তেপান। ওর কথা শেষ হতে না হতেই যান্ত্রিক আওয়াজে পারভোজভের শেষ আর্তনাদ ঢাকা পড়ে গেল, আর সেইসঙ্গে—

হ্যাঁ, সেইসঙ্গে এক হ্যাঁচকা টানে স্তেপানও ঢুকে গেল যন্ত্রটার ভেতর ! নীল আলোর ঝলসানি। বিকট এক আর্তনাদ তুলে আপনা থেকেই থেমে গেল যন্ত্রটা !

সার্জেন্ট পেত্রোভ ছুটে এসেছিল সবার আগে। শিঙার ভেতর মুখ ঢুকিয়ে কিছুই নজরে এলো না ওর।

বিস্ময়ে হতবাক জনতার মধ্যে থেকেও অনেকে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল যন্ত্রটাকে। তাদেরই কেউ একজন যন্ত্রের হাতলে চাপ দিলো। নাঃ, দিব্যি ঘুরছে হাতলটা—দুদিকেই। কিন্তু যন্ত্রের আর কোন সাড়াশব্দ নেই !

আমরাই দায়ী এই পরিণতির জন্য '—মলোক্‌টভের গলা এতক্ষণে

শোনা যায় ঃ পারভোজভের মতো লোককে এসব জায়গায় মাইল খানেকের মধ্যে আসতে দেওয়া উচিৎ হয়নি।—

—কিন্তু ঐ স্তেপান অগ্রুৎসভ্ লোকটাই বা কী? যন্ত্র বানালো, অথচ তার তাকে চালানোর কায়দা শিখিয়ে দিয়ে গেল না কাউকে!

—সে সুযোগ আর ও পেল কোথায়? তার আগেই তো বেচারাকে—

এখানেই ঘটনার ইতি। শহরের সেরা ইঞ্জিনিয়াররা বহুদিন ধরে যন্ত্রটার কলকব্জাগুলোর কাজকর্ম বোঝার চেষ্টা করেছে। তাতে অবশ্য ফল কিছুই হয়নি। মলোকটভ্ ওটার নাম দিয়েছে—'আগামী শতকের যন্ত্র।' সার্জেন্ট পেত্রোভ এখনও ডিউটি করে গলির মুখে। শুধু ডাস্টবিনের ধারে ফলকটার গায়ে আবছা ছবিটার দিকে চোখ পড়লেই ঘুরিয়ে নেয় অন্যদিকে।

অভিযাত্রী

ভ্যালেন্টিনা ঝুরাভলেভা

আমাদের মহাকাশ-মিউজিয়ামের জগৎজোড়া খ্যাতি, অথচ আমি যে আজ পর্যন্ত একটি বারের জন্যেও এখানে আসিনি—সেটা সত্যিই আশ্চর্যের। আশ্চর্যের কথাটা বলছি এই কারণেই যে আমি নিজে মহাকাশ অভিযানে না বেরলেও, মহাকাশচারীদের শরীর মনের সুস্থতা বজায় রাখার দায়িত্ব বর্তেছে আমার মতো কিছু ডাক্তারের ওপর। আমাকে অবশ্য ডাক্তার না বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষক বলাটাই উচিৎ। আমার গবেষণার বিষয় ঃ মহাকাশচারীদের মন। গ্রহান্তর অভিযানের সময় মহাকাশচারীদের মধ্যে যেসব মানসিক উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলি নিরাময়ের রাস্তা খুঁজে বের করাটাই আমার কাজ।

ভাবছেন হয়তো, মহাকাশচারীদের মধ্যেও মনের রোগ আবার দেখা দেয় নাকি? হ্যাঁ, অবশ্যই দেয়। এখনকার এই আয়ন-রকেটের যুগে প্রায় আলোর গতিতে মহাকাশ পাড়ি দেওয়া সম্ভব হলেও, কাছাকাছি কোন নক্ষত্র জগতে গিয়ে পৌঁছনো প্রায় বিশ-পঁচিশ বছরের

ধাক্কা। এই সুদীর্ঘ সময়টায় পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি-কলকব্জা প্রায় সবই স্বয়ংক্রিয়। অতএব মহাকাশপাড়ির সময় মহাকাশচারীদের বছরের পর বছর নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে হয় বদ্ধ খুপরীর মধ্যে। সে যে কী একঘেয়েমির ব্যাপার তা বলে বোঝানো মুশ্কিল। এই জন্যই মহাকাশচারীদের বাছাই করার সময় 'মনের জোর' যাচাই করে নেওয়া হয়। এছাড়া, প্রত্যেক মহাকাশচারীরই যাতে নিজস্ব কোন জোরালো 'হবি' থাকে—তা সে গান-বাজনা, ছবি-আঁকা, মূর্তি-গড়া কিংবা বই-পড়া—যাই হোক না কেন, সেটাও দেখে নেওয়া হয়। মহাকাশযানের মধ্যে একঘেয়ে সময় কাটাতে এইসব শখ বা হবিগুলি কতটা কার্যকরী—এসবের সাহায্যে মানসিক অস্থিরতার থেকে মহাকাশচারীরা কতটা রেহাই পেয়ে থাকেন, সেটাই আমার গবেষণার বিষয়। মহাকাশ-মিউজিয়ামে এবারের এই আসাটাও পুরনো আমলের মহাকাশচারীদের শখ-আহ্লাদ-আচার-আচরণ সম্পর্কে খোঁজ নিতে।

মিউজিয়ামের ডিরেক্টরের নাম আমি আগেই শুনেছি। একসময় উনি নিজেও একজন পয়লা সারির মহাকাশচারী ছিলেন। রকেটের জ্বালানীর বিস্ফোরণে ওঁর একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায়। আমার গবেষণার বিষয় জানিয়ে ওঁকে আগেই জানিয়েছিলাম—ফলে মৌখিক আলাপ সাঙ্গ হতেই সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন উনি। বললেন, 'আপনি প্রথম যুগের মহাকাশচারীদের মনোবল সম্পর্কে জানতে চান তো?'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিতেই বললেন, বার্নাডের তারার দিকে প্রথম যে অভিযানটি চালানো হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ নিশ্চয়ই আপনার অজানা। আসলে, সিরিয়াস, প্রোকিওন বা ৬১-সিগনী ইত্যাদির বিষয়েই আমাদের উৎসাহ বেশি ; ঐসব নক্ষত্রে যেসব অভিযান চালানো হয়েছে সেগুলির প্রচারও হয়েছে ভাল। অথচ বার্নাডের-তারার অভিযাত্রীদের—বিশেষ করে ঐ অভিযানের নেতা অ্যালেক্সি জারুবিন-এর কাহিনী যদি আপনি না শোনেন, তবে মহাকাশচারীদের মনস্তত্বটাই সঠিক জানা হবে না আপনার—'

'তা, আপনার এখানে কি ঐ অভিযানের বিষয়ে কোন কাগজ-পত্র রয়েছে?' আমতা আমতা গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

'কাগজপত্র? ডকুমেন্ট?'—ডিরেক্টর ভদ্রলোক চোখের কালো-চশমাটা খুলে রেখেছিলেন টেবিলের ওপর। তারপর মুখে কেমন

একটা ম্লান হাসি ফুটিয়ে একটা মোটা ফাইল এগিয়ে দিয়েছিলেন আমার দিকে।

ফাইলটা এখন খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে আমার পড়ার টেবিলে। কাগজগুলোর রঙ ঈষৎ হলুদ, তবে প্লাস্টিক সলিউশনে ভিজিয়ে নেওয়ার দরুন ওগুলো যথেষ্ট দৃঢ় এবং মসৃণ। আমি একটা একটা করে পাতা উল্টোতে থাকি,....

বার্নাডের তারার দিকে মহাকাশযান পাঠানোর পরিকল্পনা প্রথম যখন নেওয়া হয়—সেসময় নিউক্লীয় জ্বালানীর ব্যবহার শুরু হলেও —মহাকাশযানের মধ্যে বিপুল পরিমাণ জ্বালানী মজুত রাখা এবং তার সাহায্যে সেই যানকে পঞ্চাশ-একশো বছর চালু রাখার কায়দা তখন জানা ছিল না। পৃথিবী থেকে বার্নাডের তারার দূরত্ব ছ' আলোকবর্ষের কাছাকাছি। হিসেব করে দেখা গেল—ঐ তারার জগৎ থেকে একবার ঘুরে আসতে নিদেন পক্ষে চোদ্দ বছর সময় দরকার। সেসময় যে রকেট ব্যবহার করা হতো—তার সাহায্যে নক্ষত্র-অভিযান সম্ভব হলেও মাঝপথে তার ইঞ্জিন বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যে ছিল না তা নয়। তার ওপর, জ্বালানীর পরিমাণ সীমিত। ফলে, ঐরকম একটা বিপদসংকুল অভিযানের নেতাকে খুঁজে বের করতে তখনকার নিয়োগকর্তাদের যে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়েছিল, তা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না। নেতা হিসেবে এমন একজনকে চাই যার মধ্যে থাকবে অসাধারণ সাহস, ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং যে কোন পরিস্থিতিতে চট্‌পট্‌ সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা।

সিলেকশন কমিটির রিপোর্টগুলো উল্টোতে থাকি। হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত মানুষটির খোঁজ মিলেছে। নাম অ্যালেক্সি জারুবিন। এরপর মনের মতো সহ-অভিযাত্রীদের বেছে নেওয়ার দায়িত্ব ক্যাপ্টেনের—সেটাই রীতি। একাজটা করতে জারুবিন-এর সময় লেগেছে সামান্যই। এমন পাঁচজনের সঙ্গে ও যোগাযোগ করেছে যারা আগে কোন না কোন সময়ে ওর সঙ্গে মহাকাশপাড়ি দিয়েছে। জারুবিনকে নেতা হিসেবে পেলে যে ওরা নির্ভয়ে যে কোন অভিযানে বেরোতে প্রস্তুত তা নির্দ্ধিধায় জানিয়ে দিয়েছে ওরা।

অভিযাত্রীদের প্রত্যেকের খুঁটিনাটি বিবরণ আর ছবি রাখা আছে ফাইলে। ক্যাপ্টেন জারুবিনের বয়স তখন ছাব্বিশ ; ছবিতে অবশ্য আর একটু বয়স্ক দেখাচ্ছে। নাকটা চোখালো, শক্ত চোয়ালের ওপর একটা ভরাট মুখ ; ঢেউখেলানো চুলের নীচে অসাধারণ দু'টো চোখ —শান্ত অথচ বুদ্ধিদীপ্ত।

ক্যাপ্টেনের সংগীদের মধ্যে রয়েছে এক ইঞ্জিনিয়ার দম্পতি ; মহাকাশযানের প্রধান চালক হিসেবে যাকে মনোনীত করা হয়েছে—বয়সে সে সকলের বড়। অভিযাত্রীদের মধ্যে আর একজন মহিলাকে পাওয়া যাচ্ছে—পেশায় ডাক্তার। এরা ছাড়া রয়েছে একজন অ্যাস্ট্রো-ফিজিসিস্ট যার মুখে বেশ বড়সড় এক পোড়ার দাগ—এর আগের এক অভিযানে দুর্ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন।

নিজের পেশা ছাড়া কার কিসে উৎসাহ সেটাও বিশদ ভাবে লেখা আছে রিপোর্টে। প্রধান চালক গানবাজনায় আগ্রহী ; গান লিখে তাতে সুর দেন নিজেই। মহিলা ডাক্তারটির আবার অণুবীক্ষণিক জীব সম্পর্কে দারুণ উৎসাহ ; ঘন্টার পর ঘন্টা মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে, বসে থাকতে ক্লান্তি নেই। তরুণ অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টের শখ-বিভিন্ন ভাষা শেখা ঃ ইতিমধ্যে পাঁচ-পাঁচটা ভাষা আয়ত্ব করেছে ; এবারের অভিযানে ল্যাটিন আর গ্রীক ভাষা শিখবে বলে ঘোষণা করেছে। ইঞ্জিনিয়ার দম্পতির আবার দাবায় প্রচণ্ড আসক্তি। ক্যাপ্টেন জারুবিন-এর শখ—ছবি আঁকা ; অয়েল পেন্টিং-এ ভাল দক্ষতা আছে।

....ফাইলের কাগজ উল্টে যাচ্ছি। বার্নার্ডের তারা'র দিকে 'পোলাস' নামে যে মহাকাশযানটিকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার নক্সা আর বিবরণ দেখতে পাচ্ছি। ওটার বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বসানো হয়েছে পুরনো আমলের এক নিউক্লীয়-রিয়্যাক্টর।

শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে যাত্রাশুরু করেছে 'পোলাস'। মহাকাশ-যানের প্রচণ্ড গতিবেগের সংগে মানিয়ে নেওয়াটা সহজ নয় ; প্রথম প্রথম কাজ করা তো দূরের কথা, নড়াচড়াই দায়। সময়ের সংগে সংগে অবশ্য মহাকাশচারীদের মধ্যে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দগুলি ফিরে আসে। কম্পিউটরের নির্দেশ অনুযায়ী যাবতীয় যন্ত্রপাতি ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তার খবরদারি শুরু হয় তখন।

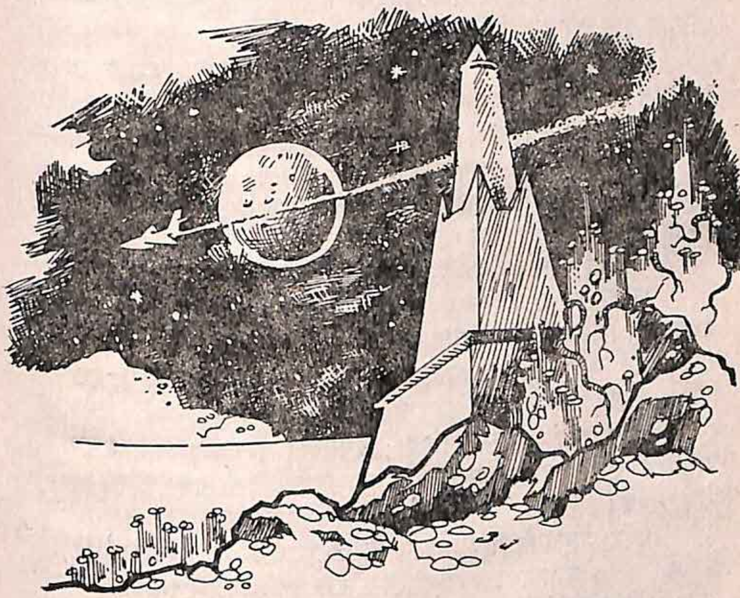
'পোলাস' যাত্রা শুরু করার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কোথাও কোন অস্বাভাবিকত্ব নেই। যন্ত্রপাতিগুলো যে সন্তোষজনকভাবে কাজ করছে তা লগ্-বুকে লেখা হয়েছে প্রতিদিন। তারপরই এক জায়গায় লেখা—'গতকাল রাত্রে আমরা শেষবারের মতো পৃথিবীর টেলিভিসন অনুষ্ঠান দেখেছি। টেলিভিসনের পর্দায় এখন আর কিছু ধরা পড়ছে না।'

পৃথিবীর সংগে বেতার যোগাযোগ অবশ্য তখনও পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি। রেডিওয় পৃথিবীর খবরাখবর ওরা পেয়েছে আরও বারো

দিন। তারপর পৃথিবী নামক গ্রহটা আকাশের গায়ে শুধুই যেন একটা আলোর টিপ্। সেই টিপ্-টাও আকাশ থেকে হারিয়ে গেল দিনকয়েক পরে।

...বিপর্যয়টা এলো কোনরকম জানান না দিয়েই।

সাতমাস পরের ঘটনা সেটা। একদিন হঠাৎ রিয়্যাক্টরের কাজ-কর্মে কিছু অসঙ্গতি দেখা দিলো। আপাত কোন কারণ ছাড়াই রিয়্যাক্টরের মধ্যে এক অতিরিক্ত পার্শ্ববিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। অবস্থাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী না হলেও ক্ষতি যা হবার হলো। মূল্যবান জ্বালানীর একটা বড় অংশ নষ্ট হয়ে গেল যন্ত্রের খামখেয়ালীপনায়।



অপরিচিত মহিলাকণ্ঠে চোখ সরালাম ফাইল থেকে। জানলার সামনে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একঝাঁক তরুণী। ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠলো ছ'-ছ'টা উৎকণ্ঠিত মুখ। অমন অভাবনীয় বিপর্যয়ের পর কী করেছিল ওরা।

গ্রীন-হাউসের পাশে খানিকটা খোলামেলা জায়গা। তারই এক দেওয়ালে ইজেল টাঙিয়ে ছবি আঁকছে জারুবিন ; আর পাশেই একা

ছোট্ট ডেস্ক-কম্পিউটারের সামনে বসে ক্রমাগত চাবি টিপে চলেছে আর একজন।

কেন শুধু শুধু কম্পিউটারকে খাটাচ্ছো, নিকোলাই ?—তুলি নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করে ক্যাপ্টেন ঃ আমরা তো আগেও একাধিকবার হিসেবগুলো কষেছি।

—কী হবে এখন ?

কী আবার হবে ?—ক্যাপ্টেন ঘড়ির দিকে তাকায় ঃ একটু পরেই খাবার ঘন্টা পড়বে। খাবার টেবিলে বসেই না হয় সবাই মিলে আলোচনা করা যাবে।

বেশ, আমি তাহলে সবাইকে গিয়ে জানিয়ে আসি।—লম্বা করিডর ধরে এগিয়ে যায় নিকোলাই।

ঠিক দশ মিনিট পর মেস-ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে ক্যাপ্টেন! পাঁচজনই বসে আছে গোল টেবিল ঘিরে। প্রত্যেকের গায়ে মহাকাশচারীর ইউনিফর্ম। ওদের চোখমুখ দেখেই বোঝা যায়—পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে ওরা কতটা সজাগ।

দেখছি, আমি একাই ইউনিফর্মটা পরতে ভুলে গেছি।—লজ্জিত গলায় বলে ওঠে ক্যাপ্টেন।

কারোর মুখ থেকে টুঁ শব্দ বেরয় না।

আপনারা তো সবাই ঘটনাটার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন।—দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ায় জারুবিন ঃ আমাদের এখন কী করণীয় সে বিষয়ে আপনাদের সকলের মতামত জানা দরকার। লীনা, তোমার বয়স যেহেতু কম—তুমিই শুরু করো।

আমি তো একজন ডাক্তার ; এখনকার সমস্যাটা যখন যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত তখন আমার মতামতটা সবশেষে জানানোই ভাল।—লীনা উত্তর দেয়।

তুমি আমাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে বিচ্ছু।—ক্যাপ্টেনের মুখ থেকে গাম্ভীর্যের থমথমে মেঘটা যেন একটু সরে যায় ঃ তুমি যে ইতিমধ্যে মনস্থির করে ফেলেছো তা আমার জানতে বাকী নেই ; তবু সকলের মতামত না শুনে মুখ খুলবেই না! যাকগে, আপনিই না হয় শুরু করুন মিস্টার সেগেই।

আমি বুঝতে পারছি না—আমাদের জ্বালানী যেটুকু নষ্ট হয়েছে তাতে অন্ততঃ বার্নাডের তারায় পৌঁছতে কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। বলে ওঠে অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট ঃ এখান থেকে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না নিশ্চয়ই।

—কিন্তু একবার ওখানে পৌঁছনোর পর—পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী যে অবশিষ্ট থাকবে না সেটা তো নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে, মাঝরাস্তা থেকে ফিরে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?

না, ক্যাপ্টেন।—মাথা নাড়ে সেগেঁই : বার্নার্ডের তারায় পৌঁছনোর পর আমরা আর কোনদিন পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবো না—আপনার এ কথাটি মানতে আমি রাজী নই। মহাকাশ বিজ্ঞানের যে হারে উন্নতি হচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে অন্য কোন উদ্ধারকারী রকেট আমাদের নিতে আসবে না তা কে বলতে পারে? আমাদের অবস্থার কথা আঁচ করে পৃথিবীর মানুষ নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকবে না।

তাহলে, আমাদের এগিয়ে যাওয়াটাই সাব্যস্ত হল?—হাসিমুখে প্রধান চালকের মুখের দিকে তাকায় ক্যাপ্টেন : জর্জ, 'পোলাস'কে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়াই দায়দায়িত্ব আপনার কাঁধে। সেগেঁই-এর সঙ্গে কি আপনি একমত?

নিশ্চয়ই! এখান থেকে ফিরে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। —জর্জের চটপট উত্তর : আমাদের পথ যে যথেষ্ট বিপদ সঙ্কুল, এ অভিযানের শুরুতে তা কি আমাদের অজানা ছিল? অনিশ্চিতের মুখে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারই তো আমরা করেছিলাম—তাই নয় কি?

—অনিশ্চিতের মুখে এগিয়ে যাওয়া—কথাটা মন্দ বলেন নি। তা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের মতামতটা এবারে জানতে হয়। নিনা, নিকোলাই—বলো কিছু।

আমাদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য—বার্নার্ডের তারা'র বিষয়ে বিস্তারিত খবরাখবর নেওয়া—তাই তো?—উঠে দাঁড়ায় নিকোলাই : ধরা যাক, ওখানে গিয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার করলাম আমরা ; যেহেতু আর ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই, পৃথিবীর মানুষকে আমাদের আবিষ্কৃত কোন তথ্যই পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না। সেক্ষেত্রে, আমাদের এই অভিযানের মূল্য কী? শুধু তাই নয়, আমরা যদি এক্ষুণি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই—তবে আগামী বছর দু'য়েকের মধ্যেই নতুন করে আর একটা অভিযানের কথা হয়তো ভাবা যাবে ; আর যদি না ফিরি, আমাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় পৃথিবীর মানুষকে বসে থাকতে হবে আরও প্রায় চোদ্দটা বছর। সেদিক থেকে আমাদের তো মনে হয়—পৃথিবীতে এই মুহূর্তেই ফিরে যাওয়া উচিৎ।

সম্মতির আশায় স্ত্রীর দিকে তাকায় নিকোলাই।

মহিলা ডাক্তারটি এতক্ষণে মুখ খোলে,—আপনি নিজে কী মনে করেন, ক্যাপ্টেন ?

মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে জারুবিন বলে ওঠে—আমার তো মনে হয়, ইঞ্জিনিয়ারদের কথাই ঠিক। ওদের কথায় হয়তো আবেগ নেই, কিন্তু যুক্তি আছে। সত্যিই তো, আমরা যখন আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি, তার ফলাফল পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে না পারলে এই অভিযানই তো অর্থহীন।

সবার নিষ্পন্দ মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে ক্যাপ্টেন আবার বলতে থাকে ঃ আসলে দুটো রাস্তাই আমাদের সামনে খোলা রয়েছে এখন, এক—আমরা আর সময় নষ্ট না করে পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারি ; দুই—জ্বালানীর অভাব সত্ত্বেও আমাদের লক্ষ্য—বার্নার্ডের তারায় গিয়ে পৌঁছতে পারি এবং সেখান থেকে পৃথিবীতে ফিরেও আসতে পারি।

সেটা কীভাবে সম্ভব ?—বিস্ময়ে চোখ দু'টো বড় বড় হয়ে ওঠে নিকোলাই-এর ঃ যথেষ্ট জ্বলানী না থাকলে ফিরবো কি ভাবে ?

—আমারও সেটা জানা নেই। তবে বার্নার্ডের তারায় পৌঁছতে এখনও বহু মাস বাকী। এর মধ্যে পৃথিবীতে ফিরে আসার কোন একটা উপায় নিশ্চয়ই আমরা খুঁজে বের করতে পারবো।

আপনি ঠিকই বলেছেন।—ক্যাপ্টেনের কথায় সায় দেয় নিকোলাই ঃ আমরা এগিয়েই যাবো।

তাছাড়া ক্যাপ্টেন, আপনার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে আমাদের সকলের।—লীনা বলে ওঠে ঃ বার্নার্ডের তারায় পৌঁছনোর পর আমাদের মজুত জ্বালানীর মাত্র ১৮ শতাংশ অবশিষ্ট থাকবে—প্রয়োজনের তুলনায় যা খুবই কম। তবু আপনি যখন বলছেন, ঐ জ্বালানীটুকুর সাহায্যে 'পোলাস'-কে ফিরিয়ে আনার এক উপায় নিশ্চয়ই বেরোবে। জর্জের কথাটাই ঠিক। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলেই না আমাদের এই অভিযান এত রোমাঞ্চকর !...

* * *

ক্যাপ্টেন জারুবিনের আঁকা কোন ছবি আছে আপনাদের মিউজিয়ামে ?—মিউজিয়ামের ডিরেক্টরের সঙ্গে আবার দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ অবশ্যই।—বলেই ভদ্রলোক আমায় ওপরের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন।

...সবশুদ্ধু গোটা দশেক ছবি ; সবগুলো তেলরঙে আঁকা। একটা ছবিতে দেখি—নীল আকাশের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে দু'টি ছেলেমেয়ে ; পিঠে তাদের পক্ষীরাজের ডানা। আর একটি ছবিতে—অজানা এক গ্রহের আকাশে দু'-দু'খানা সূর্য ; সূর্যের রঙ ঈষৎ কমলা।

অভিযানের পুরো রিপোর্টটা কি পড়া হয়েছে ?—ডিরেক্টর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন আমায়।

—আজ্ঞে না। আজই শেষ করতে পারবো বলে আশা করছি—।

পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছি। পোলাস-এর যাত্রাপথের খুঁটিনাটি বিবরণ। শেষ পর্যন্ত বার্নার্ডের তারার চৌহদ্দির মধ্যে গিয়ে পৌঁছনো গেল। না, পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার কোন উপায় এখনও মাথায় আসেনি কারোর। আশার আলো দেখা যাচ্ছে না—

...একসময় বার্নার্ডের তারার একটি গ্রহে গিয়ে নেমেছে 'পোলাস'। গ্রহটি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লেখা হয়েছে লগ্ বুকে। বিশুদ্ধ অক্সিজেনে পরিপূর্ণ ওখানকার বাতাস ; অথচ কোথাও কোন উদ্ভিদ অথবা প্রাণীর চিহ্ন নেই। ওখানকার তাপমাত্রা অবশ্য জীবন ধারণের পক্ষে প্রতিকূলই বলতে হবে। থার্মোমিটারের পারা শূন্যের প্রায় ৫০ ডিগ্রি নীচে থেকেছে সবসময়।

এরপর পাতার পর পাতা জুড়ে গ্রহটির বিবরণ লেখা হয়েছে ; সেখানকার মাটি এবং হাওয়ার নমুনা ভরে নেওয়া হয়েছে পলিথিনের ব্যাগে। পৃথিবীর গাছপালা ওখানে টিকতে পারবে কিনা—সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা চালানো হয়েছে।...

অবশেষে একদিন সবাইকে ডাকলো ক্যাপ্টেন—ফেরার জন্য এবারে তৈরি হন আপনারা—।

প্রায় আদেশের সুরেই যেন কথাগুলো বললো জারুবিন,—এটা ঠিকই যে প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ জ্বালানী পড়ে রয়েছে ট্যাঙ্কে ; তবু এর সাহায্যেও পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হতে পারে যদি আমরা রকেটের ওজন বেশ খানিকটা কমিয়ে ফেলতে পারি। আমি বলি কি—ভারী ইলেকট্রনিক সরঞ্জামগুলি খুলে নেওয়া হোক ; 'পোলাস'-এর ভেতরে যেসব পার্টিশন দেওয়াল আছে—সেগুলিরও কোন প্রয়োজন নেই। আর একটা ব্যাপার—আপনারা জানেন যাত্রাশুরুর পর মহাকাশযানের অ্যাক্সিলারেশন যেহেতু খুব একটা বাড়ানো সম্ভব হয় না সেজন্য জ্বালানীরও বেশ খানিকটা অপচয় হয়। আমার ধারণা—স্বাভাবিকের চেয়ে অন্ততঃপক্ষে

চারগুণ বেশি অ্যাক্সিলারেশনে যাত্রা শুরু করলে জ্বালানীর একটা বড় অংশ বাঁচানো সম্ভব হবে।

তা কী করে হয় ?—নিকোলাই প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেঃ ঐ প্রচণ্ড অ্যাক্সিলারেশনের মধ্যে কারোর পক্ষেই মহাকাশযানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

ঠিকই, যদি সেই মহাকাশচারী মহাকাশযানের ভেতরে থাকে।—শান্ত গলায় বলে ওঠে ক্যাপ্টেন ঃ সেজন্যই ঠিক করেছি—প্রথম বেশ কয়েক মাস 'পোলাস'-এর যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রিত হবে এই গ্রহ থেকে, এবং সে কাজটা করবো আমি নিজে। আমি জানি, আপনারা আমাকে বাধা দেবেন। তবু বলছি—ক্যাপ্টেনের সিদ্ধান্তই চরম। তা মেনে নেওয়া ছাড়া আপনাদের কিছু করার নেই।

ক্যাপ্টেন জারুবিন-এর নির্দেশে মহাকাশযান-নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় যন্ত্রপাতি নামানো হলো গ্রহটির মাটিতে। ক্যাপ্টেনের থাকার জন্য ছোট্ট একটা ঘর বানানো হলো, প্রয়োজন মতো খাবার দাবারও রাখা হলো, তবে বছরের পর বছর ধরে ঐ হিমশীতল গ্রহে শরীরকে উত্তপ্ত করে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী দেওয়া গেল না কিছুতেই।

ঠিক যেমনটা চাওয়া হয়েছিল, তেমনিভাবে যাত্রা শুরু করেছিল পোলাস। প্রথম কয়েক মাস ক্যাপ্টেনের গলার স্বর বেতারে ভেসে এসেছিল অভিযাত্রীদের কাছে—তারপর তাও হারিয়ে গেল চিরকালের মতো।

* * *

রিপোর্টটা পড়া শেষ। ওটা ফেরৎ দিতেই আবার গেলাম ডিরেক্টরের ঘরে।

আসুন, আসুন।—সাদর অভ্যর্থনা জানালেন ভদ্রলোক ঃ চলুন পাশের ঘরে গিয়ে বসি।

পাশের ঘরটা অনেকটা ড্রয়িংরুমের মতো ; সুন্দর সব সোফা ; দেওয়ালের মাঝামাঝি একটা বড় ছবি। ছবিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ডিরেক্টর বললেন,—ঐ যে দেখছেন, ওটাই হলো ক্যাপ্টেন জারুবিনের আঁকা শেষ ছবি।

কী বলছেন ?—আমি চমকে উঠি ঃ ক্যাপ্টেন কি শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে পেরেছিলেন ?

না, সে প্রশ্নই ওঠে না।—ভদ্রলোক চশমাটা খুলে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখেন ঃ জারুবিন জানতো—ও কোনদিনই আর পৃথিবীর মুখ দেখবে না। বলতে গেলে, আর পাঁচজন সঙ্গীকে বাঁচাতে গিয়ে আত্ম-

ইত্যাই করেছিল ও। বার্নার্ডের তারার সেই অচেনা-অজানা গ্রহে মারা যাওয়ার আগে ঐ ছবিটাই এঁকেছিল ক্যাপ্টেন।

ছবিটার দিকে ভাল করে তাকাই। একটা চওড়া রাস্তা—বহু দূর চলে গেছে ; একটা ঝাঁকড়া গাছ তার ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই রাস্তার ধারে।

ডিরেক্টর আমার কাঁধে হাত দেন,—চোদ্দ বছর পর ঐ গ্রহে পেঁছে ঐ ছবিটা উদ্ধার করেছিলাম আমি। ছবিটার সঙ্গে একটা চিরকুটও ছিল।

আপনি নিজে গিয়েছিলেন ?—নতুন বিস্ময়ে ডিরেক্টরের মুখের দিকে তাকাই আমি ঃ কী লেখা ছিল ঐ চিরকুটে ?

ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হলেও এগিয়ে চলো।—ডিরেক্টার রুমাল বের করে চোখটা মুছে নেন।

আমি আবার ছবিটার দিকে তাকাই। এক নিঃসঙ্গ মানুষের মুখ ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে ; অচেনা গ্রহে বসে ছবিতে তুলির টান দিচ্ছে। আশ্চর্য, জীবনের শেষ ছবিটা আঁকতে বসে পৃথিবীর কথাই মনে পড়েছিল লোকটার—পৃথিবীর গাছ, পৃথিবীর পথ—

নাকি, এগিয়ে চলার প্রতীক হিসাবেই পথটাকে এঁকেছিল ক্যাপ্টেন ? মনে মনে সেটাই আমি বোঝার চেষ্টা করতে থাকি।

ছদ্মবেশ

আব্রাম ডেভিডসন

রাস্তাটা অপরিষ্কার থাকে প্রায় সব সময়েই। তেল-কালি-ঝুল মাখা সাইকেলের দোকানটা ঐ রাস্তার সঙ্গে একেবারে মানানসই হয়েছে বলতে হবে। সবাই জানে, ওটা ফার্ড আর অস্কারের দোকান। দু'জনে গলায়-গলায় বন্ধু, সাইকেল সারাই-এর কাজে দুজনেই সমান চৌকস, কিন্তু স্বভাবচরিত্রে দুজনের মধ্যে মিল নেই একরত্তি ! অস্কার হাসি-খুশী, গলা চড়িয়ে কথা বলে সবসময়। সাইকেল মেরামতের জন্য একবার কেউ দোকানে এলেই ওর বন্ধু বনে যায়। ফার্ড কথা বলে কম ; কারোর কোন সমস্যার কথা কানে এলেই উদ্বেগে একেবারে ছটফট করতে থাকে।

দোকানটা থেকে মন্দ আয় হয় না দুজনের। শুধু সাইকেল মেরামত নয়, সেই সঙ্গে সামনে বড় পার্কটায় যারা বেড়াতে আসে তাদের কাছে ঘন্টা হিসেবে সাইকেল ভাড়া দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সাইকেল ভাড়া নিতে দোকানে এলেই অস্কারের আর কাজে মন বসে না। হাতুড়ি-স্ক্রু-ড্রাইভার নামিয়ে রেখে দিব্যি তাদের সঙ্গে গল্পে মেতে যায়। কখনো বা গল্প করতে করতে চলে আসে পার্কে ; চাই কি, কাউকে কাউকে সাইকেল চালানো শেখাতেও লেগে যায়।

—শুনছেন ?

ফার্ড কাজ করতে করতে আড়চোখে তাকায়। মাঝবয়সী এক মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন দোকানের সামনে। পাশেই পেরাম্বুলেটারে বসে মোটাসোটা একটা বাচ্চা এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

একটা সেপটিপিন হবে এখানে ?—ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমার এই বাচ্চাটার ইজেরটা খুলে গেছে।—

হাতের রেন্‌জ্‌টা নামিয়ে রেখে ঘরের কোণে টেবিলের ড্রয়ারটা হাতড়ায় ফার্ড। ড্রয়ারের মধ্যে দু-তিনটে সেফটিপিন ও নিজেই রেখেছিল। এখন কিন্তু একটারও দেখা মেলে না।

সত্যি কাজের সময় কক্ষনো যদি একটা সেফটিপিন পাওয়া যায় !—দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ভদ্রমহিলা বিরক্তমুখে পেরাম্বুলেটার ঠেলতে শুরু করেন।

দুপুরবেলা দোকান ঘরেই খাওয়া সেরে নেয় দুই বন্ধুতে। সেদিন খেতে বসে সেফটিপিনের প্রসঙ্গটা তুললো ফার্ড।

—ড্রয়ারের মধ্যে কয়েকটা সেফটিপিন রাখা ছিল, তুই দেখেছিলি ?

হ্যাঁ, দেখেছিলাম মনে হচ্ছে।—অস্কার অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয়।

—কোথায় যে গেল ? এক ভদ্রমহিলা একটা সেফটিপিনের খোঁজ করছিলেন। দিতে পারলাম না। বাচ্চাটার ইজের খুলে গেছে—বেশ অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছে ওঁকে।

থামো তো।—অস্কার বিরক্ত হয় ঃ এই রাস্তাতেই এক গণ্ডা দোকান আছে যেখানে সেফটিপিন পাওয়া যায়।

—কিন্তু ড্রয়ারে রাখা সেফটিপিন কেন পাওয়া যাবে না ? ফার্ড বিড় বিড় করতে থাকে।

অস্কার উঠে দাঁড়ায়। বলে,—ওসব কথা থাক্। লাল রঙের যে

সাইকেলটা অ্যাক্সিডেন্টের পর মেরামতির জন্য এসেছে—ওটার কাজে কি হাত দিবি আজ?

দেখা যাক।—নিরাসক্ত গলায় জবাব দেয় ফার্ড।

ফার্ডের শখ—চারপাশের গাছপালা, পোকামাকড়, জীবজন্তুদের খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা। একদিন একটা গিরগিটির ছানা ধরে কাঁচের শিশির মধ্যে পুরে ফেলেছিল ও। কেমনভাবে গিরগিটিরা গায়ের রঙ পাল্টে ফেলে তা কাছ থেকে দেখাই ছিল ওর আসল উদ্দেশ্য।

জন্তু জানোয়ারের ছদ্মবেশের কথা শুনেছিস?—সেদিনই অস্কারকে বললো কথাটা : ভারী অদ্ভুত ব্যাপার—।

—কাল টি. ভি তে এডি অ্যাডামস তো মেরিলিন মনরো সেজে এসেছিল ; তা, জন্তুজানোয়ারও ছদ্মবেশ ধরে নাকি?

শুধু কি জন্তুজানোয়ার? পোকামাকড়রাই বা কম কিসে?—ফার্ড বন্ধুকে বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে : যেমন ধর, একটা ফড়িং গাছের পাতায় এমনভাবে বসবে—দেখে মনে হবে যেন ওটা গাছেরই আর একটা পাতা। তারপর যেই না কোন পোকা কাছে এলো, অমনি কপাৎ করে গিলে ফেলবে তাকে! অন্যদিকে আবার পাখীদের হাত থেকেও বাঁচোয়া—

তুই বলছিস, ওরা নিজেদের চেহারাটা পুরো পাল্টে নিতে পারে?—অস্কারের গলায় অবিশ্বাসের ছোঁয়া।

তিন সত্যি করে বলছি, আমি নিজেই দেখেছি।—ফার্ড নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে : জানিস্, দক্ষিণ আমেরিকায় একধরনের কচ্ছপ পাওয়া যায় যাদের চেহারা অবিকল পাথরের চাঁই-এর মতন। পাথর ভেবে তো মাছেরা যেই কাছে আসে, অমনি গিয়ে পড়ে সেই কচ্ছপের খপ্পরে। কিংবা ধর, সুমাত্রার সেই মাকড়সার কথা, পেট উলটে পড়ে থাকলে যাদের চেহারাটা হয় অবিকল পড়ন্ত পাখীর মতো। ঐ অবস্থায় ওরা প্রজাপতি ধরে খায়—।

অস্কার হাসছিল হোঃ হোঃ করে। কোন মজার কথা মনে পড়েছে হয়তো। ফার্ড ওর দিকে আড়চোখে তাকায়।

অ্যাই, আমার পেন্সিলটা কোথায় রাখলাম বলতো?—ফার্ড এ পকেট সে পকেট হাতড়ায়।

অস্কার বলে,—তুই সেদিন বলেছিলি ড্রয়ারের মধ্যে সেফটিপিন রেখে আর পাসনি। এখন একবার খুলে দ্যাখ্, ড্রয়ার ভর্তি সেফটিপিন।

ফার্ড হাঁ করে অস্কারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর ঠিক সেইসময় দরজার ওপাশ থেকে কে যেন হাঁক দেয়—কে আছে এখানে?

এক্ষুণি আসছি, একটু দাঁড়াও।—অস্কার চেঁচিয়ে ওঠে।

ফার্ড দেখে, দরজার গায়ে সাইকেলটাকে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাচ্ছে এক কিশোর। ওর মুখটা চেনা চেনা। অস্কারের সঙ্গে মাঝে মাঝে পার্কে গিয়ে আড্ডা দেয়। আজও নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্যেই এসেছে।

ফার্ডরে, এই যাবো আর আসবো। তুই ততক্ষণ ঐ সাইকেলটার ব্রেক দু'টা পাল্টে ফ্যাল্—বলেই একলাফে দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় অস্কার। ফার্ড জানে, সন্ধ্যে পেরনোর আগে আজ আর টিকি দেখা যাবে না ওর।

সন্ধ্যের আগেই অবশ্য শিষ দিতে দিতে ফিরে এলো অস্কার। ফার্ডকে জড়িয়ে ধরে বললো,—অনেকদিন পর আজ একটা সিনেমা দেখলাম জানিস?

ফার্ড গম্ভীর মুখে অস্কারের সাইকেলটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিলো; তারপর অস্কারকে একেবারে হকচকিয়ে দিয়ে হাতুড়ির এক ঘা কষিয়ে দিলো সাইকেলের রডে।

তুই কি পাগল হয়ে গেছিস?—ফার্ডকে থামানোর চেষ্টা করে অস্কার।

ফার্ডের গায়ে তখন অসুরের শক্তি। টেনে টেনে চাকার স্পোক-গুলোকে খুলতে থাকে ও।

তুমি শুধু পাগলই নও, হিংসুটেও বটে।—অস্কার তেতো গলায় বলে ওঠে: ইচ্ছে করলে নিজেও তো গিয়ে স্ফূর্তি করতে পারো। তা তোমার তো ওসব ভাল লাগে না।

সাইকেলটা ফেলে রেখে উঠে দাঁড়ায় ফার্ড। কেমন যেন অবসন্ন দেখাচ্ছে ওকে। টুপিটা তুলে নিয়ে ক্লান্ত পায়ে বাড়ীর দিকে হাঁটতে থাকে ও।

এরপর পাক্কা দুদিন দুজনের মধ্যে কথা বন্ধ। তৃতীয় দিন অস্কারই এসে ফার্ডের পিঠে হাত রাখে।

—সেদিন রাগের মাথায় আমার সাইকেলটার তো বারোটা বাজালি। আয় দুজনে মিলে ওটাকে এবার সারিয়ে ফেলি।

এক গাদা সাইকেলের মধ্যে থেকে অস্কারের সাইকেলটাকে টেনে বার করে ফার্ড। অস্কার বলে,—আশ্চর্য ব্যাপার, দোমড়ানো সাই-

কেলটা মেরামত করলি কখন ? এটাকে এত চক্‌চকেই বা দেখাচ্ছে কেন ?

রিজেনারেশন—পুনর্জন্ম।—বিড় বিড় করে বলে ওঠে ফার্ড ঃ টিকটিকির ল্যাজ ছুঁয়ে দেখেছিস কখনো ?

মানে ?—ফার্ডের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে অস্কার।

—টিকটিকির ল্যাজ ছুঁলেই দেখবি, ওটা কেমন খসে যায়। ক'দিন পরই আবার নতুন ল্যাজ গজায়। এক ধরনের কেঁচো আছে জানিস—যাদের দু আধখানা করে কেটে ফেললেও সেগুলো মরে না। প্রত্যেকটা অংশ থেকে নতুন কেঁচো জন্মায়। ব্যাঙেদের ঠ্যাঙ কেটে ফেললে নতুন ঠ্যাঙ গজায়।



তোর কথাগুলো খুব অদ্ভুত, আমি স্বীকার করছি।—অস্কার বলে উঠে ঃ এবারে আমায় বলতো—পুরনো সাইকেলটাকে এমন চক্‌চকে করলি কী দিয়ে ?

—সাইকেলটা আমি ছুঁয়েও দেখিনি।

—কী বলছিস্ ? এর স্পোকগুলো সব টেনে টেনে বাঁকিয়ে

ফেলালি—তা আপনা থেকেই ওগুলো সব সোজা হয়ে গেল, বলতে চাস ?

এটা আসলে সাইকেলই নয়!—স্থির কণ্ঠে বলে ওঠে ফার্ড।

শোন্ ফার্ড,—অস্কার বোঝাতে চেষ্টা করে : তুই যে পুনর্জন্মের কথা বলালি, ধরে নিলাম সবই ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা তো শুধু জ্যান্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেই খাটে, তাই না ? সাইকেল তো আর জ্যান্ত নয়।

ফার্ড আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে : একটা ভাঙা ক্রিস্টাল কিংবা পাথরের টুকরো আপনা থেকেই অন্য আকার নিতে পারে—যদি পরিবেশটা ঠিক মতো পায়। তুই বলছিলি না, ড্রয়ারের মধ্যে অনেকগুলো সেফটিপিন দেখেছিস—একবার দ্যাখ্ তো, ওগুলো এখনো আছে কিনা।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও টেবিলের দিকে এগিয়ে যায় অস্কার। তারপর ড্রয়ারটা খুলেই চেঁচিয়ে ওঠে—না—আ—আ। আশ্চর্য, একটু আগেও দেখেছি, সব উবে গেল কি করে ?

অস্কারের কথা শেষ হতে না হতেই আলমারিটা এক টানে খুলে ফ্যালে ফার্ড,—দেখেছিস—আলমারি ভর্তি হ্যাংগার। ওগুলো কি আগে ছিল, বল ?

অস্কার কাঁধ ঝাঁকায়,—আচ্ছা, এমন তো হতে পারে—তুই কিংবা আমি অন্যমনস্কভাবে সেফটিপিনগুলো অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছি, কিংবা হ্যাংগারগুলিকে রেখে দিয়েছি আলমারীতে।

ফার্ডের দু'চোখে একরাশ আতঙ্ক। অস্কারের দুটো হাত জাপটে ধরে বলে,—আমার বড় ভয় করছে রে!

জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে থাকে ওর,—তোকে বলেছিলাম না, পোকামাকড় জন্তুজানোয়াররা কেমন করে ছদ্মবেশ ধরে। আচ্ছা, এমন তো হতে পারে—ঐসব সেফটিপিন-হ্যাংগার—ওগুলো আসলে সব ছদ্মবেশ। এমন তো হতে পারে—শৈশবে যাদের আকার সেফটিপিনের মতো—বড় হয়ে সেগুলিই হ্যাঙ্গারের চেহারা নেয়। মানে, প্রজাপতির ক্ষেত্রে তো দেখেছিস—প্রথমে শুককীট, তারপর শুঁয়োপোকা—আমি বলছি অস্কার, আমরা ওগুলোকে যতটা নিরীহ ভাবছি ওগুলো ততটা নিরীহ নয়—শিকারের আশায় বসে আছে। দূর করে দে, ওগুলোকে দূর করে দে।

আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকে ফার্ড।

কী সব বলছিস পাগলের মতো ?—ফার্ডের কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে

দেয় অস্কার ঃ আজ যেটাকে দেখছি সেফটিপিন—কাল সেটাই হয়ে যাবে হ্যাঙগার ?

ঠিক তাই।—ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে ওঠে ফার্ড ঃ আজ যেটাকে দেখছো গুটিপোকা—কাল সেটাই হবে মথ ; আজ দেখছো ডিম—কাল ওটা থেকেই মুগীর ছানা বেরুবে। তফাৎ শুধু একটাই—অন্যগুলোর রূপান্তর আমাদের চোখের সামনে ঘটে ; আর এদের রূপান্তরটা হয় আমাদের অগোচরে।

ফার্ড, ফার্ড—ভাই আমার।—অস্কারকে অসহায় দেখায় ঃ তোর শরীরটা খারাপ হয়েছে। আয়, আজ দোকান বন্ধ করে বাড়ী যাই। তুই ক'দিন বিশ্রাম নে—আমার সাইকেলে করেই তোকে পৌঁছে দেবো, চল্।

ফার্ড, ইতস্ততঃ করে। তারপর অস্কারের পীড়াপীড়িতে সাইকেলে চাপতেই গড়িয়ে পড়ে যায় রাস্তায়।

দেখলি, আমাকে ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো।—সাইকেলটার দিকে বিতৃষ্ণ নয়নে তাকায় ফার্ড ঃ তোকে বলছি—ও নিশ্চয়ই আমাকে খুন করতে চায়—আমি ওর রহস্য ধরে ফেলেছি কিনা।

বলেই রাস্তা ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে ফার্ড।

মিস্টার হোয়াটনে-কে এতসব কথা অবশ্য বলেনি অস্কার। শুধু বলেছে,—আমি এখন একাই ব্যবসা দেখছি। যা কিছু মেরামতের কাজ, সব একাই সামলাতে হয়।

মিস্টার হোয়াটনে আজ অনেকদিন পর এসেছেন। এক সময় যখন এ পাড়ায় থাকতেন, তখন এ দোকানে নিয়মিত যাতায়াত ছিল ওঁর।

আমি এবারে বিয়ে করবো, ঠিক করেছি।—হাতের তেলকালি মুছতে মুছতে বলে অস্কার।

আপনাকে অভিনন্দন।—হোয়াটনে দরাজ গলায় হাসে ঃ চলুন না পাশের রেস্তোরায় বসে একটু কফি খাওয়া যাক্।

কফি খেতে খেতে মিস্টার হোয়াটনে তাঁর নতুন বাসস্থান, ছেলে-মেয়ে-বৌ-এর গল্প করেন। তারপর এক সময় হঠাৎ বলে ওঠেন,—আপনার পার্টনারের কিন্তু কাজে কর্মে দারুণ মন ছিল। কোনদিন কাজ ফেলে বাইরে যেতে দেখিনি। তা, হঠাৎ কি হলো যে বাইসাইকেলে বিতৃষ্ণা এসে গেছে ওঁর ?

সবই ঠিক ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী যে হল ওর !—মাথা নীচু করে বলতে থাকে ফার্ড ঃ কী যেন একটা ভয় ওকে ঘিরে

থাকতো সব সময়। তারপর একদিন সকালে একটু দেরী করে দোকানে এসে দেখি—কোটের হ্যাংগারে পেঁচিয়ে মরে পড়ে আছে ও।

অস্কারের চোখের কোণটা জলে চিকচিক করে।

বেচারা!—বলেই বেয়ারাকে বিলটা আনার জন্য হাঁক দেন হোয়াটনে।

বড়দিনের তারা

আর্থার সি. ক্লার্ক

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি যা কিছু করেন তা জগতের কল্যাণের জন্য—একথা এখন আর আমি মানতে পারছি না। হ্যাঁ, আমার মতো ধর্মভীরু খৃষ্টান, যার ধার্মিকতা এখনও বন্ধুবান্ধব-সহকর্মীদের হাসি ঠাট্টার খোরাক জোগায়—হায়, সেই আমিও কিনা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারালাম! এর জন্য যার অবদান অনেকখানি সেই সিক্সথ্ জেনারেশন কম্পিউটারটা আমার সামনেই রয়েছে এখনো। আমাদের এবারকার অভিযানে যে বিপুল তথ্য আমরা পেয়েছি, যে অসংখ্য ছবি আমরা তুলেছি—ঐ কম্পিউটার তা নির্ভুলভাবে বিশ্লেষণ করে যে সত্যটুকু আবিষ্কার করেছে তা জেনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি, আমার এতদিনের সযত্নলালিত বিশ্বাস ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের আগে কেউ কখনো এতদূরের অভিযানে বেরয়নি। পৃথিবী থেকে 'ফিনিক্স নীহারিকা'—লক্ষ কোটি মাইল পাড়ি দিয়েছি আমরা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটেছে মহাকাশযানের ঢাউস পেটের মধ্যে। তারপর সেই একঘেয়ে বিরক্তিকর দিনগুলির শেষে যখন ফিনিক্সের চৌহদ্দিতে গিয়ে পৌঁছলাম—আমাদের অবস্থা তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচার মতন।

ফিনিক্স-কে নীহারিকা বলাটাই সবচেয়ে বড় ভুল। এটা আসলে একটা ছোট্ট তারা—অথবা তারা'র ভগ্নাবশেষ বলাটাই ভাল। তাকে ঘিরে পাক খাচ্ছে বস্তুকণার রাশি; ওগুলো জমাট বেঁধেই হয়তো নতুন গ্রহনক্ষত্র তৈরী হবে একদিন। সে অবশ্য দূর-ভবিষ্যতের কথা। এখন ওগুলোকে ঘন মেঘ ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। আর সেই

মেঘের শেষ প্রান্তে রয়েছে একটা ছোট্ট গ্রহ ; তারাটির ভগ্নাবশেষকে ঘিরে এখনও যা আবর্তিত হচ্ছে তা অতি ধীর বেগে।

ফিনিক্স-নীহারিকার স্বরূপ আমাদের অনেকদিন থেকেই জানা। প্রতিবছর আমাদের ছায়াপথে একশোরও বেশী তারা'র ঔজ্জ্বল্য হঠাৎ অনেকটা বেড়ে যায়। তারাগুলির মধ্যে বিস্ফোরণের দরুণই যে এমনটা ঘটে তা এখন আমাদের জানা। কয়েক ঘন্টা অথবা কয়েকদিন ধরে আকাশকে আলোর দীপ্তিতে ভরিয়ে দিয়ে সে তারার ঔজ্জ্বল্য কমতে থাকে একটু একটু করে ; তারপর আবছা হতে হতে একসময় আকাশ থেকে তার শেষ আলোটুকুও মুছে যায়। এখন থেকে হাজার বছর আগেও এ ঘটনা মানুষের চোখে পড়েছে। হঠাৎ করে যেসব তারারা জ্বলে ওঠে তাদের 'নতুন তারা' ভেবে নিয়ে নাম দেওয়া হয়েছিল 'নোভা'। ল্যাটিনে 'নোভা'র অর্থ নব।

ফিনিক্সে বিস্ফোরণ ঘটেছিল এখন থেকে কয়েক হাজার বছর আগে। কোন কোন নক্ষত্র কেন যে হঠাৎ নিজের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয় সে সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার জন্যই ফিনিক্স নীহারিকায় অভিযান চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ফিনিক্স-কে কেমন চেহারায় দেখাবে তার একটা আন্দাজ অবশ্য আগেই করা হয়েছিল। কারণ আমরা জানতাম—যে তারা বেহিসাবীর মতো হু হু করে নিজের আলো-তাপকে খরচ করে ফেলে পরে সে কৃপণের মতো নিজের অবশিষ্ট ধনকে আগলে রাখে। এককালে যা ছিল সূর্যের চেয়েও বড় এক জ্বলন্ত নক্ষত্র—নিজের শরীর খুবলে বস্তু-কণাদের বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে সে তখন এক ক্ষুদে গোলকের আকার নেয়। আয়তন তখন তার পৃথিবীর মতো হলেও—ওজনে সে পৃথিবীর চেয়ে লক্ষগুণ ভারী! কোটি কোটি মাইল ছড়িয়ে থাকা মেঘের মাঝে যেন ছোট্ট একটা আলোর টিপ—জ্যোতির্বিদদের ভাষায় 'শ্বেতমানব তারা'।

ফিনিক্স নীহারিকার ঐ কেন্দ্রবিন্দুকে লক্ষ্য করেই আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত একদিন গেয়ে পৌঁছলাম ফিনিক্স-কে ঘিরে থাকা ধুলো আর মেঘের রাজত্বে।

আমাদের যন্ত্রপাতিগুলো নিখুঁত ভাবে কাজ করছিল। নীহারিকার কেন্দ্রে প্রায় পৌঁছে গেছি। আমাদের সামনে ক্ষুদে নক্ষত্র। একসময় ওটাই নাকি ছিল আমাদের গনগনে সূর্যের মতো। লক্ষ-কোটি বছরে যে আলো-তাপ ফুরনোর নয়—নিজের বেখেয়ালে

কয়েক ঘণ্টায় তা খরচ করে এখন ওর ভুল শোধরানোর পালা। নক্ষত্রের এত কাছে—তবু তাপের আঁচটুকুও যেন টের পাচ্ছি না।

ঐ একরত্তি তারাকে ঘিরে কোন গ্রহের যে অস্তিত্ব থাকতে পারে প্রথমটায় তা কল্পনাই করিনি আমরা। আগে যদি কোন গ্রহ থেকেও থাকতো—ফিনিক্সে বিস্ফোরণের পর আগুনের প্রখর তাপে সেসব গ্রহের স্রেফ উবে যাওয়ারই কথা। তবু আমাদের সন্ধানী যন্ত্রকে রুটিন-মাফিক কাজে লাগিয়েছিলাম—যদি কোথাও কোন গ্রহের সন্ধান পায় সেই আশায়। তা, আমাদের আশা বিফলে যায়নি। বলতে গেলে, সূর্য থেকে প্লুটোর যা দূরত্ব—তার চেয়েও দূরে এক ক্ষুদে গ্রহের খোঁজ মিললো। নক্ষত্র থেকে অতদূরে থাকার দরুনই হয়তো আগুনের আক্রোশ থেকে বেঁচে গেছে। গ্রহটার খোঁজ পাবার পর—একবার ওখানে না গেলেই নয় ; অন্ততঃ ওখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা তা না জেনে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার যখন প্রশ্নই ওঠে না!

ন্যাড়া পাথুরে গা, গাছপালার কোন চিহ্ন নেই। ফিনিক্সের একমাত্র গ্রহটির কাছে পেঁছিনোর ঢের আগেই অবশ্য বুঝেছিলাম—ওখানে জীবন্ত কোন প্রাণীর সঙ্গে মোলাকাতের সম্ভাবনা থাকতে পারে না। ফিনিক্সে যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল তার তাপে ওখানকার মাটির ওপরে বায়ুমণ্ডলের কোন চিহ্ন নেই আর। তবু আমরা ঐ গ্রহে নামার পরিকল্পনা নিলাম। কারণ—আমাদের শক্তিশালী ক্যামেরায় ওখানকার পাথুরে জমির ওপর একটা-সুবিশাল স্তম্ভ চোখে পড়েছিল। স্তম্ভের মসৃণ ছাদে নানারকম জ্যামিতিক চিহ্ন আঁকা ; ওগুলো যে বুদ্ধিমান প্রাণীর কীর্তি তা বুঝতে কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। বেশ বোঝা যায়—ওখানকার বাসিন্দারা কোন এক সময় অনেক যত্নে ঐ পাহাড়-সমান উঁচু স্তম্ভটা বানিয়েছিল—গ্রহান্তরের মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে। তাছাড়া আমাদের ডিটেক্টরে নির্দিষ্ট মানের তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল। ঐ অচেনা গ্রহের মানুষেরা নিশ্চয়ই জানতো—প্রাকৃতিক কোন কারণে স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস হলেও—ওদের ঐ তেজষ্ক্রিয় বিকিরণের ব্যবস্থা এক উন্নত সভ্যতার স্বাক্ষর বয়ে চলবে অনন্তকাল ধরে।

স্মৃতিস্তম্ভের কাছে পেঁছিতেই একটা ব্যাপার আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল। ওর চুড়োটার নীচে যে প্রকাণ্ড বাড়ী—সেটা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী হয়েছিল। বাড়ীটার চারপাশে উঁচু পাথরের চাঁই। তবু তার মধ্যেই ওর অদ্ভুত স্থাপত্য নজরে এলো। বাড়ীটার কোথাও কোন ফাঁক ফোকর নেই। এর অর্থ একটাই হতে

পারে। অন্ততঃ আমার তো মনে হয়েছিল—গ্রহের অধিবাসীরা আসন্ন ধ্বংসের আঁচ পেয়ে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি জীবনধারার পরিচয় রেখে গেছে ঐ গুহের মধ্যে—গ্রহান্তরের আগন্তুকদের কৌতূহল চরিতার্থের জন্যই।

না, আমাদের কাছে পাথরের পুরু দেওয়াল কাটার উপযোগী আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না। ফলে পাথর ড্রিল করতে হলো সেই প্রাচীন কায়দায়। দেওয়াল সরতেই চোখের সামনে খুলে গেল প্রাক্তন গ্রহবাসীদের বিপুল ঐশ্বর্যের ভান্ডার। সে ঐশ্বর্য যে এক পুরুষের



সঞ্চয় নয় তা বুঝতে আমাদের কারোরই কষ্ট হয়নি। ওদের মৃত্যু যে ঘনিয়ে আসছে তার সংকেত নিশ্চয়ই বহুবছর আগেই পেয়েছিল গ্রহের বাসিন্দারা। অনেক চিন্তাভাবনার পরই হয়তো স্মৃতিস্তম্ভ গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল ওরা। তারপর ধীরেসুস্থে বছরের পর বছর ধরে একে একে নিজেদের সৌন্দর্যবোধ, পরিশ্রমের ফসলগুলিকে থরে থরে সাজিয়ে রেখে গেছে ওদের সেই বিশাল স্মৃতিকক্ষে। ওরা জানতো—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ মুছে না যাওয়ার ওটাই ছিল একমাত্র রাস্তা। একদিন কেউ না কেউ এসে ওদের ঐ

ঐশ্বর্যের হদিস পাবেই—এমন একটা বিশ্বাস নিশ্চয়ই ওদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে ছিল!

ওদের সব ছিল। ওরা নিজেদের সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত চালাতো। কেবল অন্য কোন নক্ষত্রে পাড়ি দেওয়ার মতো প্রযুক্তিটাই আয়ত্ব করতে পারেনি। অবশ্য তা পারলেও কি আর গ্রহের সকলে মিলে বহু আলোকবর্ষ দূরের কোনও নক্ষত্রজগতে সত্যিই পাড়ি দেওয়া সম্ভব ?

ওদের ছবি আর মূর্তিগুলি দেখে আমরা চমকে উঠেছিলাম। ওদের চেহারার সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের কী অসম্ভব মিল! সেই সঙ্গে ওদের রেখে যাওয়া অসংখ্য ফিল্ম ; প্রোজেক্টরের সাহায্যে ওগুলোকে স্ক্রীনে ফেলতেই ওদের চলাফেরা, কাজকর্ম—সব জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠলো পর্দায়। হাজার হাজার বছর আগে রেকর্ড করা ওদের সুরেলা কণ্ঠস্বরের আওয়াজে গমগম করতে লাগলো চারধার। ওদের ভাষা যাতে আমরা শিখে নিতে পারি তারও বন্দোবস্ত রেখেছিল ওরা। সহজ সরল ভাষা—রেকর্ড বাজিয়ে তা শিখে নিতে সময় লাগেনি। তারপরই ওদের গান, ওদের কথা, ওদের আনন্দ—সবকিছু অর্থবহ হয়ে ধরা দিলো আমাদের কাছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নত হয়েও অনাড়ম্বর জীবন যাত্রায় অভ্যস্থ—ওদের সম্পর্কে এই ধারণাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আমাদের মনে। স্মৃতিকক্ষ তন্ন তন্ন করে হাতড়েও আমরা এমন কোন জিনিস পেলাম না যাতে মনে হয়—ঐ গ্রহের বাসিন্দাদের মধ্যে কখনো কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে। ওদের চরিত্রের এই দিকটাই আমাকে বিস্মিত করেছিল সবচেয়ে বেশী।

কে জানে, পৃথিবী থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে ছিলাম বলেই বোধহয় আমাদের মতো অথবা আমাদের চেয়েও উন্নত এক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখে আমরা সকলেই কেমন আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। তা না হলে, পৃথিবীতেও তো কত প্রাচীন সব সভ্যতার নিদর্শন মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে। কই, সেগুলো দেখে কোন পুরাতাত্ত্বিক অথবা পর্যটকের মন দুঃখে গলে গেছে এমনটা তো কখনো শুনিনি।

আমার সহ-অভিযাত্রী মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করেছে,—আচ্ছা তোমার ঈশ্বর কি এই গ্রহের বাসিন্দাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেন না ?

আমার মুখে কোন উত্তর যোগায়নি। আমি বলতে পারিনি, আমাদের সর্বশক্তিমান পিতা যা করেন তা মঙ্গলের জন্য। সত্যি তো,

ঐসব নিষ্পাপ-সহজ-সরল মানুষদের এমন করুণ পরিণতি কি আদৌ কাম্য ছিল ?

আমি জানি, আমার বন্ধুরা পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে কী বলবে। ওরা বলবে,—আমরা একটা মৃত গ্রহ দেখে এলাম। একসময় ওখানে জলবাতাস ছিল, পাখী গান গাইতো, বুদ্ধিমান প্রাণীদের এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। নেহাৎ প্রাকৃতিক কারণেই অবশ্য গ্রহটি এখন নিষ্প্রাণ ; ওখানকার ফুল-পাখী-মানুষ—সব মরে গেছে হাজার হাজার বছর আগে। নাঃ, বেঁচে থাকার মতো পরিবেশই আর নেই ওখানে। অবশ্য এতে অবাক হবারই বা কী আছে ? প্রতিবছরই তো কত নক্ষত্রে বিস্ফোরণ ঘটে—তাদের গ্রহগুলো সব ধ্বংস হয়ে যায়। সেইসব গ্রহের কোন কোনটায় সভ্য প্রাণীও নিশ্চয়ই থাকে। তাদের স্বভাব চরিত্র ভাল না মন্দ তার ওপর নিশ্চয়ই তাদের মৃত্যু ঘটা না-ঘটা নির্ভর করে না।

নাঃ, ওখানকার সভ্যতা ধ্বংসের জন্য ঈশ্বরকে ওরা অবশ্যই দায়ী করবে না, কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্বেই যে ওদের বিশ্বাস নেই।

না, না—এমন ভাবে ব্যাপারটাকে দেখতে আমি রাজী নই। যারা ঈশ্বরকে মানে না—তাদের সেই না-মানার মধ্যে আবেগটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। আমি তো আর নাস্তিক নই। আমি জানি, সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বর তাঁর কাজকর্মের জন্য আমাদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। তিনি তাঁর খুশী মতো কোন জগৎ যেমন গড়তে পারেন তেমনি তা ধ্বংসও করতে পারেন নির্দ্বিধায়। তাঁর কাজের ভালমন্দ বিচারের কোন অধিকার নেই আমাদের।

না, এসব কথা মেনে নিতে আমার মনে কোন দ্বিধা নেই। তবুও কখনো কখনো এমন ঘটনাও ঘটে যখন বুকের অতল গভীরে সযত্নে পালন করা বিশ্বাসটা নাড়া খেয়ে যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার ক্ষেত্রে সেই ঘটনাটাই ঘটে গেল।

ফিনিক্সের বিস্ফোরণটা যে কয়েক হাজার বছর আগে ঘটেছিল তা আমাদের জানা থাকলেও একেবারে সঠিক দিনক্ষণটা আমি মাপতে পেরেছিলাম—ঐ গ্রহের মাটি পাথরকে রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষণের পরই। এখন জানি, ঠিক কবে ঐ নক্ষত্র জ্বলে ওঠে ওর গ্রহজগৎকে ধ্বংস করেছিল, আর কবে সেই বিস্ফোরণের আলো এসে ধরা দিয়েছিল পৃথিবীর মানুষের চোখে। আমি এখন বেশ বুঝতে পারি—সেদিন পৃথিবীর পূর্বদেশের আকাশে সূর্যোদয়ের ঠিক আগের মুহূর্তে

নতুন এক তারাকে অপূর্ব দীপ্তি নিয়ে জ্বলে উঠতে দেখে কতটা বিস্মিত হয়েছিল লোকেরা।

না, আমার কম্পিউটারের হিসেবে কোন ভুলচুক থাকতে পারে না। দু'হাজার বছরের রহস্যের জট খুলেছি আমি। আর তাই তো ঈশ্বর—তোমার কাছে জানতে চাই—আকাশে তো কত লক্ষকোটি নক্ষত্র ছিল—যীশুর জন্ম মুহূর্তে জ্বলে ওঠার জন্য অন্য কোন নক্ষত্রকে কি আর বেছে নিতে পারতে না?

বেথেলহেমের আকাশে নতুন তারার জন্ম দিতে একটা সুন্দর গ্রহের সমস্ত অধিবাসীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়াটা কি সত্যিই খুব জরুরী ছিল—ঈশ্বর?

গাধা

আইজ্যাক অ্যাসিমভ

টেবিলের ওপর বিশাল এক জাবদা খাতা—তারই একটা খোলা পাতার দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে বসে ছিল 'নারোন'—আন্তর্নাক্ষত্রিক খবর আদান প্রদানের মূল কেন্দ্রের সবচেয়ে পুরনো কর্মী। ওর কাজটা একঘেয়ে হলেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ছায়াপথের কোন তারকা-পরিবারের কোন গ্রহে বা উপগ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণীর জন্ম হচ্ছে তার হিসেব রাখতে হয় ঐ জাবদা খাতায়; হিসেবে একটু ভুলচুক হলেই মুশকিল। নারোন মাঝে মাঝেই ভেবে অবাক হয়—এই ছায়াপথের কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহের প্রায় সবই নিষ্প্রাণ। সবশেষ খবর অনুযায়ী মাত্র ঊনত্রিশ হাজারের কিছু বেশী গ্রহ বা উপগ্রহে প্রাণীর বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরি হয়েছে,—অর্থাৎ, এসব জায়গায় তাপমাত্রা সহ্যসীমার মধ্যে। যে কোন প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য অক্সিজেন, জল আর কোন একটা নক্ষত্রের তাপ এবং আলো—এসবও এখানে রয়েছে প্রয়োজনীয় মাত্রায়। তবে হ্যাঁ, এই ঊনত্রিশ হাজারের মধ্যে বহু গ্রহেই প্রাণধারনের অনুকূল পরিবেশ প্রাণীর উদ্ভব হয়ে থাকলেও প্রাকৃতিক, জীবরাসায়নিক কিংবা সামাজিক কোন বিপর্যয়ে প্রাণের বিকাশ চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। এরকম কোন খবর এলে নারোনকে ঐ খাতাটা থেকে সেই গ্রহের নামটা

কেটে বাদ দিতে হয়। এছাড়াও আর একটা হিসেব রাখতে হয় ওকে। যেসব গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীরা বিজ্ঞান-বুদ্ধির পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে সেইসব গ্রহের নামগুলো জাবদা খাতা থেকে তুলে নিয়ে পাশের একটা ছোট খাতায় লিখতে হয় ওকে। ছোট খাতাটায় যেসব জায়গার নাম উঠেছে সেখানকার অধিবাসীরাই আসলে এই আন্তর্নক্ষত্র কেন্দ্র গঠন করেছে। নারোন মাঝে মাঝেই খাতাটা উল্টে দেখে। ওখানে উঠেছে এমন গ্রহ-উপগ্রহের সংখ্যা এখনও বড় কম। তবে একবার কোনও নাম ঐ ছোট খাতায় তোলার পর তা যে আর কেটে দিতে হয় না—এই যা বাঁচোয়া। আসলে যে কোনরকম বিপর্যয় থেকে নিজেদের সভ্যতাকে বাঁচানোর কৌশল আয়ত্ব করেছে ঐসব জায়গার সুপরিণত বুদ্ধিমান প্রাণীরা।

নারোনের হঠাৎ খেয়াল হয়, ওর সামনেই এসে দাঁড়িয়েছে 'ইশুর'—নারোনের কাছে খবর পৌঁছে দেওয়াই ওর কাজ।

—নতুন কোন খবর আছে নাকি?

—হ্যাঁ। আর একদল বুদ্ধিমান জীব তাদের বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণতায় পৌঁছেছে।

—তাই নাকি? খুব ভাল কথা। নারোন জাবদা খাতাটাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে ঃ ওদের বাসস্থানের বিস্তারিত বিবরণ দাও।

আমাদের ছায়াপথের দ্বিতীয় গলির ২ ঃ ১১৮ নক্ষত্রের তৃতীয় গ্রহে ঐ বুদ্ধিমান প্রাণীরা রয়েছে।—ইশুর ওর হাতের কাগজটার দিকে তাকায় ঃ ঐসব প্রাণীদের ভাষায়, ওদের গ্রহের নাম 'পৃথিবী' আর যে নক্ষত্রকে তা আবর্তন করে চলেছে তার নাম 'সূর্য'।

নারোন বড় খাতাটার পাতা উল্টোতে উল্টোতে 'পৃথিবী' সংক্রান্ত তথ্যগুলি খুঁজে পেয়ে বলে,—এই তো দেখছি, পৃথিবী ছাড়া সূর্যের বাকী সমস্ত গ্রহই নিষ্প্রাণ। অবশ্য ভবিষ্যতে পৃথিবীর ঠিক আগে-পরের দুটো গ্রহে প্রাণধারণের পরিবেশ গড়ে ওঠা একেবারে অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না —পৃথিবীর বুদ্ধিমান প্রাণীরাই বা এত কম সময়ের মধ্যে বুদ্ধির পূর্ণতায় পৌঁছলো কি করে? ভাবতে পারো, ওদের হিসেবে মাত্র শ'খানেক বছর আগে ওরা বৈদ্যুতিক আলোর কথা জানতো না? ওরা তো একটা রেকর্ড করে ফেললো দেখছি!

ইশুর কোন উত্তর দিল না। নারোন পুরনো খাতাটা থেকে পৃথিবীর নাম আর খুঁটিনাটি বিবরণ কেটে দিয়ে পরিষ্কার করে আবার তা ছোট খাতাটায় লিখে ফেললো। তারপর ইশুরের দিকে

চেয়ে বললো,—ভাল কথা, আমাদের পর্যবেক্ষণকারীরা কোন ভুলটুল করে বসেনি তো? পৃথিবীর বর্দ্ধিমান প্রাণীদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কথা একটু খুলে বলতো, শুনি।

ইখুর হাতে-ধরা কাগজটা থেকে রিপোর্ট পড়ার ঢঙে চলতে শুরু করে,—পৃথিবীর বর্দ্ধিমান জীব এখন মহাকাশ-অভিযানে সক্ষম। এদের যে একটি মাত্র উপগ্রহ রয়েছে সেখানে বেশ কয়েকবার ওরা অভিযাত্রীদের পাঠিয়েছে তাছাড়া ওরা মহাকাশযান পাঠিয়েছে ওদের নিজেদের নক্ষত্রপরিবারের বেশ কয়েকটা গ্রহে এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাষ, ওদের নিজেদের মধ্যে টেলি-যোগাযোগ ইত্যাদির কাজে ওরা ইতিমধ্যেই বেশ কতকগুলি কৃত্রিম উপগ্রহকে কাজে লাগিয়েছে। সম্প্রতি ওরা মহাকাশ ফেরীও তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে।

বাঃ, বাঃ।—নারোনের গলায় খুশীর স্বর ঃ ওরা আমাদের এই আন্তর্নাক্ষত্র কেন্দ্রের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা নিশ্চয়ই করেছে?

না, তা অবশ্য করেনি।—ইখুর জবাব দেয় ঃ তবে ইতিমধ্যেই ওরা 'পাইওনিয়ার' নামে একটা মহাকাশযান দূর-মহাকাশে পাঠিয়েছে যা সূর্যের গ্রহ-পরিবারের সীমানা ছাড়িয়ে পাড়ি দেবে সূর্যের কাছাকাছি ২ ঃ ১৩৪ নক্ষত্রের দিকে। পৃথিবীর প্রাণীরা ঐ নক্ষত্রটিকে চেনে 'রোহিনী' নামে।

—ও, তবে তো আমাদের সঙ্গেও যোগাযোগ হলো বলে।—নারোন উৎফুল্ল স্বরে বলে ওঠে ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক থেকে ওরা যে সত্যিই সাবালকত্ব অর্জন করেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

ইখুর চুপ করে শুনে যায়। আসলে, কোন ব্যাপারেই ও কোন মতামত দেয় না। ওর কাজ শুধু খবর পৌঁছে দেওয়া। নারোন ছোট খাতাটা বন্ধ করতে করতে জিজ্ঞাসা করে,—ওরা নিশ্চয়ই ওদের শক্তি-চাহিদা মেটাতে ওদের নক্ষত্রের আলো এবং তাপকে ব্যবহার করে?

ইখুর মাথা নাড়ে। বলে,—না। ওরা সূর্যের শক্তিকে ওদের কাজে লাগানোর কথা সবে ভাবতে শুরু করেছে।

নারোন অবাক হয়ে যায়,—তা হলে কিভাবে ওরা ওদের খাবার দাবার বানায়? ওদের যানবাহনই বা চলে কি করে?

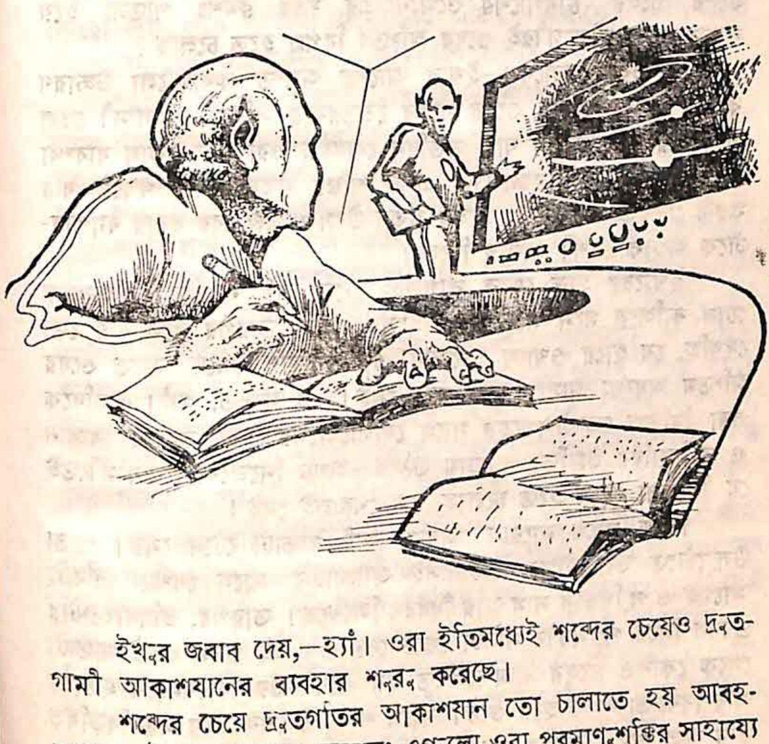
বলতে গেলে, ওদের গ্রহের অভ্যন্তরে সঞ্চিত কয়লা আর জ্বালানী তেলই ওদের শক্তির প্রধান উৎস।

তার মানে তো হাইড্রোকার্বন?—নারোনকে হঠাৎ খুব চিন্তিত

দেখায় ঃ হাইড্রোকার্বন পড়ে বাতাসে মেশার ফলে ওখানকার বাতাস তো প্রতিনিয়তঃ দূষিত হচ্ছে ?

হ্যাঁ, তা হচ্ছে।—ইখুর নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দেয় ঃ তবে ইদানীং ওখানে পরমাণু শক্তিকেও কাজে লাগানোর কিছু কিছু চেষ্টা চলছে।

ইখুরের কথায় নারোন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে,—ওরা যখন মহাকাশ তৈরি করতে সক্ষম তখন ওদের গ্রহের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাবার জন্য ওরা নিশ্চয়ই দ্রুতগতির আকাশযান ব্যবহার করে ?



ইখুর জবাব দেয়,—হ্যাঁ। ওরা ইতিমধ্যেই শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী আকাশযানের ব্যবহার শুরু করেছে।

শব্দের চেয়ে দ্রুতগতির আকাশযান তো চালাতে হয় আবহমণ্ডলের উপরের অংশে। অন্ততঃ এগুলো ওরা পরমাণুশক্তির সাহায্যে চালায় নিশ্চয়ই ?

ইখুর আবার মাথা নাড়ে। বলে,—না। এ ক্ষেত্রেও সেই জ্বালানী তেলই....।

নারোন চমকে ওঠে ; উত্তেজনায় এবার ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে,—তার মানে, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোকার্বন গ্যাস —এই সব ছড়িয়ে পড়ছে ওদের আবহমণ্ডলের ওপরের স্তরে, অর্থাৎ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ? কী সাংঘাতিক ! তাহলে তো স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে মিশে থাকা 'ওজোন'-এর পরিমাণও ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। আচ্ছা ঐসব বুদ্ধিমান প্রাণীরা কি জানে না—'ওজোন'-স্তরই আসলে ওদের নক্ষত্র থেকে বেরিয়ে আসা অতিবেগুনী রশ্মি এবং অন্যান্য ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মির হাত থেকে ওদের বাঁচিয়ে রেখেছে ? ওরা কি বোঝে না— ওদের গ্রহের চারপাশের 'ওজোন'-এর স্তর ক্রমশঃ পাতলা হয়ে যাবার ফলে শীগ্‌গীরই ওদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে ?

সম্ভবতঃ বোঝে।—ইখুর আস্তে আস্তে কথাগুলো উচ্চারণ করে ঃ তবে যতদিন ওদের গ্রহের ভেতরকার সঞ্চিত জ্বালানী তেল একেবারে ফুরিয়ে না যায় ততদিন বোধহয় ওরা অন্য কোন ব্যবস্থা নেবে না। ওদের বিজ্ঞানীরা এখন শক্তির নতুন উৎস খুঁজে বার করার চেয়েও জ্বালানী তেলের নতুন উৎস খুঁজে বের করার ব্যাপারটাকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে।

ইখুরের হাত থেকে কাগজটা টেনে নেয় নারোন। কাগজটায় চোখ বুলিয়ে মনে মনে সব হিসেব কষে। তারপর বলে,—এ তো দেখছি, যে হারে ওখানে 'ওজোন'-এর পরিমাণ কমছে—তাতে ওদের অন্তিম অবস্থা আসতে আর দেরি নেই। কি অদ্ভুত, অ্যাঁ। একদিকে ওরা বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছে, বিজ্ঞান ও কারিগরির উন্নতির চূড়োয় উঠছে—অথচ নিজেদের বোকামীতেই যে নিজেরা ধ্বংস হতে চলেছে, সে খেয়ালই নেই !

বিরক্ত মুখে নারোন আবার ছোট খাতাটা টেনে নেয়। পাতা উল্‌টোতে উল্‌টোতে ঠিক সেই জায়গাটায় আসে যেখানে একটু আগেই ও পৃথিবীর নাম আর বিবরণ লিখেছে। তারপর, ভবিষ্যৎদ্রষ্টার প্রত্যয় নিয়ে পৃথিবীর নামটা কেটে দেয় ও। এই প্রথম ছোট খাতাটা থেকে কোনও গ্রহের নাম কাটতে হয় ওকে—ওর চোখেমুখে হতাশা আর বিষণ্ণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুখে শুধু ও শেষবারের মত বিড়বিড় করে বলে ওঠে,—গাধার দল !

শুধু একজন

ইগর রসোখোভাৎস্কি

ট্রাকটাকে এলোপাথাড়িভাবে ছুটে আসতে দেখেই পথচারীরা সরে দাঁড়িয়েছিল পথের ধারে—বাড়ী আর দোকানগুলোর একেবারে গায়ে। তবু শেষরক্ষা হলো না। রাস্তার গর্তগুলোয় জমে থাকা নোংরা জল এসে লাগলো অনেকেরই গায়ে। তামাকের ছোপ-লাগা দাঁতগুলো বের করে কেমন বিচ্ছিরিভাবে হাসছিল ট্রাক-ড্রাইভারটা।

ভিক্টর নিকোলায়েভিচ্ একবার তাকালো নিজের প্যান্টের দিকে ; অন্ততঃ তিন-চারজায়গায় কাদার দাগ লেগেছে। বাড়ী ফেরার পর এ নিয়ে যে বৌ-এর সঙ্গে যথেষ্ট অশান্তি হবে—তা মনে মনে আঁচ করে নিতে কষ্ট হলো না ওর।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ভিক্টরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল যে ছেলেটি—তাকে দেখে চিনতে পারার কথা নয়। ওদের ইনস্টিট্যুটের ল্যাবরেটরী অ্যাসিস্ট্যান্ট, তরতাজা তারুণ্যে সবসময় যেন টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। ভিক্টরও একসময় অমন সতেজ ছিল—পথ চলার সময় অন্য কারোর দিকে নজরই দিতো না। এখন এই ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সে অবশ্য যৌবনের চঞ্চলতার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সহকর্মীরা ওকে নিরীহ-নিষ্কর্মা বলেই মনে করে। এত বছর গবেষণার পর নিজের ডক্টরেট ডিগ্রিটাও বাগাতে পারেনি বেচারা !

তা, গবেষণার স্বীকৃতি না পাক, ওর এতদিনের সাধনা যে ব্যর্থ হয়নি—এটা ভেবেই মনটা খুশীতে ভরে ওঠে ভিক্টরের। হ্যাঁ, মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে বহুগুণ বাড়ানোর কৌশল ওর আয়ত্বে এসেছে। সেই কতবছর আগে—মানসিক রোগের হাসপাতালে গিয়ে গবেষণার এই বিষয়টা ওর মাথায় এসেছিল। মানসিক রোগীদের অনেকেই যে মাঝে মাঝে প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কী প্রচন্ড আসুরিক শক্তিতে চীৎকার করে, চারপাশের জিনিস ভাঙচুর করে—তা ও দেখেছিল। পাঁচজন জোয়ান মিলে একজন রোগীকে টেনে ধরে রাখতে পারে না ; আবার অন্যদিকে, এমন অনেক রোগীও দেখেছে, হাজার চেষ্টাতেও যাদের এক ফোঁটা জল খাওয়ানো যায় না। ঐ সব রোগীদের অপরিসীম

একগংুয়েমীর জন্য যে স্নায়ুর ভেতরকার 'কে-নিউরোন'গুলি দায়ী—তা জানা ছিল ভিক্টরের। মানসিক রোগীদের শরীরে 'কে-নিউরোন'-গুলি বেশীমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠলে ওরা যে ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড অশান্ত হয়ে ওঠে—তা প্রমাণিত হয়েছিল বহু আগেই। বস্তুতঃ একদল শারীরবিজ্ঞানী এমন এক কায়দা রপ্ত করার চেষ্টাও চালাচ্ছিলেন যার সাহায্যে ঐ বিশেষ ধরনের নিউরোনগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে রোগীদের আবার স্বাভাবিক করে তোলা যায়।

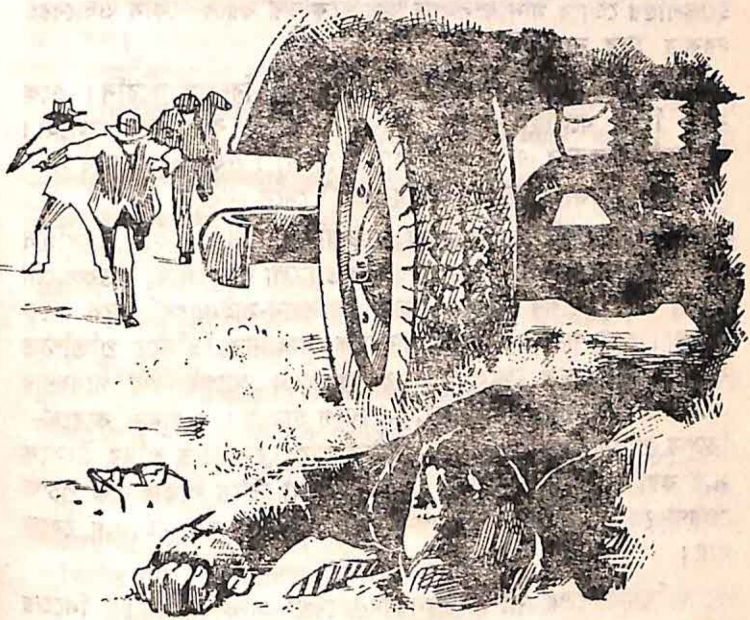
একমাত্র ভিক্টরই কিন্তু প্রথম থেকেই সমস্যাটাকে দেখেছে একেবারে অন্যভাবে। ও নিজেকে প্রশ্ন করেছে—এমন কিছু কি করা যায় না যাতে সুস্থ স্বাভাবিক লোকের মধ্যে 'কে-নিউরোন'গুলিকে সংহত করে তাদের ইচ্ছাশক্তিকে বহুক্ষণ বাড়িয়ে তোলা যাবে—অথচ তাদের মধ্যে মানসিক রোগের অন্যান্য সব লক্ষণ পাবে না ?

রাস্তার ওপর একটা সাজানো-গোছানো দোকান—কাঁচের ভেতর দিয়ে নানা মডেলের টেলিভিসন-সেট দেখা যাচ্ছে। কাঁচের এপার থেকেই সেটগুলির দাম পড়ার চেষ্টা করে ভিক্টর। ইন্‌স্‌টিট্যুট থেকে কিছু টাকা ধার করে একটা টেলিভিসন এবারে কিনে ফেলতেই হবে। বেচারা বৌ-টার সখ-আহ্লাদের দিকে তো কখনই তেমন নজর দিতে পারেনি। মুখে যদিও কখনো বলেনি, কিন্তু বাড়ীতে টেলিভিসন নিয়ে গেলে নিশ্চয়ই খুশীই হবে বৌ।

দোকানটা ছাড়িয়ে এগোতেই আবার নিজের গবেষণার বিষয়টা মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দেয়। সেই প্রথম যখন ও ল্যাবরেটরীতে কাজ শুরু করেছিল তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই এতো বছর ধরে ওর কথাগুলোকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছে সহকর্মীরা। এমনকি, প্রাণের বন্ধুকেও তো বোঝানোর কত চেষ্টা করেছে ও। বলেছে,—প্রচণ্ড প্রেরণা বা ইচ্ছাশক্তির জোরে মানুষ যে অসম্ভব-কে সম্ভব করতে পারে—এটা কি তুমি মানো না ? মুমূর্ষু রোগী শুধু মাত্র মনের জোরে দিনের পর দিন বেঁচে রয়েছে, এমনকি যে রোগীর বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই, ডাক্তারেরা যাকে জবাব দিয়ে গেছে—সেও যে ওষুধ ছাড়া দিব্যি বেঁচে উঠেছে—এমন ঘটনা তো আর বিরল নয়। প্রয়োজনের মুহূর্তে অনেকের মধ্যেই যে প্রচণ্ড মানসিক দৃঢ়তা দেখা দেয়, জরাগ্রস্থ-বৃদ্ধও যে দুর্লঙ্ঘ পাহাড়-পর্বত জয় করে, স্রেফ মনের জোরে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে মানুষ যে ছোট নৌকা কিংবা ভেলায় চেপে সাগর পারাপার করতে পারে—তা কি তুমি অস্বীকার করো ?

না, অস্বীকার করি না।—মিটিমিটি হেসে জবাব দিয়েছিল মিখাইলভ ঃ কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয়?

তাতে প্রমাণ হয়, আমাদের সকলের মধ্যেই এক বিশেষ ধরনের শক্তির ভাণ্ডার রয়েছে।—ভিক্টর স্পষ্ট জবাব দেয় ঃ কোন কারণে সেই ভাণ্ডারের মুখ খুললে জমা শক্তি বেরিয়ে পড়লেই মানুষের মধ্যে প্রেরণা যায় বহুগুণ বেড়ে। ঠিক মতো রাস্তা পেলে—হঠাৎ ছাড়া পাওয়া সেই শক্তি মানুষকে দিয়ে অসাধ্য সাধন করিয়ে নেয়; আমরা একেই বলি 'ইচ্ছেশক্তি'। মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে সেই জমা শক্তি



সোজা সরল পথে বেরিয়ে আসতে পারে না বলেই যত বিপত্তি। ওদের মধ্যে অপরিসীম মনের জোর ফুটে উঠলেও তা বিপথে চালিত হয়।

তোমার যত উদ্ভট চিন্তা।—বলেছিল মিখাইলভ ঃ বিজ্ঞানীরা এসব কথা কখনো মানবে না।

নিশ্চয়ই মানবে। আমি প্রমাণ করবো, আমার ধারণা মিথ্যে নয়।—চোখ দুটো ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠেছিল ভিক্টরের ঃ আমার বিশ্বাস

—প্রত্যেকটা প্রাণীর মধ্যে জমে থাকা ঐ বিশেষ ধরনের শক্তিকে মুক্ত করার ব্যাপারে 'কে-নিউরোনে'র হাত আছে। ল্যাবরেটরীতে ইঁদুর-গিনিপিগের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে আমি দেখেছি—'কে-নিউরোন'কে উত্তেজিত করলে ওদের মধ্যে কী প্রচণ্ড অস্থিরতা দেখা দেয়; হিস্টিরিয়া-গ্রস্থের মতো ওরা ছট্‌পট্‌ করতে থাকে—কী প্রচণ্ড শক্তি তখন ওদের গায়! আমি বলছি, 'কে-নিউরোন'গুলিকে ঠিকমতো সংহত করে মানুষের মধ্যে জমে থাকা এক প্রচণ্ড ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর উপায় একদিন নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হবে। সেদিন দেখবে, ইচ্ছেশক্তির জোরে মানুষ সমস্ত অসুখকে জয় করবে—কোন ওষুধেরই দরকার হবে না!

না, ওর কথাগুলো সেদিন মিখাইলভ বিশ্বাস করেনি। ওকে বাধা দিয়ে বলেছিল,—তুমি এখন আবেগের বশে কথা বলছো। বিজ্ঞানীরা তোমার এসব কথায় কান দেবে না; ওষুধপত্র লাগবে না—স্রেফ মনের জোরে অসুখ সারবে—একী মেনে নেওয়া যায়?

ভিক্টর সেদিন আর কথা বাড়ায়নি। সিধে ফিরে এসেছিল নিজের ল্যাবরেটরীতে। তারপর এই এতগুলো বছর শুধু কতকগুলো স্নায়ু আর বিশেষ ধরণের কিছু নিউরোন-সাইন্যাপ্স নিয়ে পড়ে রইলো। শেষ পর্যন্ত, নিজের ধারণাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে ও। বলতে গেলে মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেই ওর গবেষণার একেবারে শেষ পর্যায়ের কাজটুকুও সাঙ্গ হয়েছে। ও প্রমাণ করেছে—বিশেষ প্রক্রিয়ায় শরীরের মধ্যে আটকে থাকা অব্যবহৃত শক্তির উৎসকে মুক্ত করা সম্ভব; তার ফলে মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকার এক প্রচণ্ড প্রেরণা জেগে ওঠে, তার রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বহু-বহুগুণ বেড়ে যায়।

মিখাইলভের সঙ্গে অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। নিজের গবেষণার ফলাফলটা ওকেই প্রথম জানানো উচিত, মনে মনে ভাবলো ভিক্টর। পরক্ষণেই খেয়াল হলো, থিসিসটা আগে গুছিয়ে লিখে ফেলতে হবে; তারপর সেটাকে পেশ করতে হবে বিশেষত কমিটির কাছে। না হলে, এখন কিছু বলতে গেলেই ফের হয়তো ব্যঙ্গের হাসি হাসবে মিখাইলভ।

নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তায় নামে ভিক্টর নিকোলায়েভিচ্‌। ট্রাফিকের আলোটা লাল হয়ে রয়েছে। খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবেই রাস্তার ওপারের দিকে এগিয়ে যায় সে।

শেষ মুহূর্তে বাসটা থামানোর জন্য প্রাণপণে ব্রেক কষেছিল ড্রাইভার—কিন্তু দুর্ঘটনা এড়ানো গেল না। মুহূর্তের মধ্যে গোটা জায়গাটা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

ভিক্টরের দেহটা উপুড় হয়ে পড়েছিল রাস্তার ঠিক মাঝখানে—একটু দূরেই চশমাটা পড়েছিল কাঁচভাঙ্গা অবস্থায়। মুখের সিগারেটটা মাটিতে পড়েও কেমন জ্বলছিল!

আমায় একটু দেখতে দিন, আমি ডাক্তার।—বলতে বলতে একজন লোক এগিয়ে এলেন ভিড় ঠেলে। তারপর ভিক্টরের নাড়ী টিপে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর এদিক ওদিক চেয়ে হতাশার ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন।

অ্যাক্সিডেন্টের সঙ্গে সঙ্গেই হার্টফেল করেছে!

লোকেদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন। বাসযাত্রীদের একজন বলে উঠলো,—ড্রাইভারের কিন্তু দোষ নেই; লোকটা রাস্তার মাঝখান দিয়ে এমনভাবে হাঁটছিল, যেন কোনকিছুতে হুঁশ নেই।

ভিড়ের মধ্যে একজন বয়স্ক মানুষকে রীতিমত অবসন্ন দেখাচ্ছিল। প্রায় স্বগতোক্তির মতো করেই তিনি বললেন,—কি আর করা যাবে? পৃথিবী থেকে একজন বিদায় নিলো!

পাশের লোকটাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভদ্রলোক যেন নিজের বক্তব্যকে খোলসা করতেই বললেন,—দুনিয়ার পাঁচশো কোটি লোকের মধ্যে থেকে যদি এককোটি লোকও হঠাৎ মরে যায়, তাতেও কি অন্যদের কিছু এসে যাবে? অনেকে হয়তো খেয়ালই করবে না!

ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিলেন ভদ্রলোক। ডাক্তারের চেম্বারে ওঁকে ঠিকসময় পৌঁছতে হবে। উনি জানেন, দুরারোগ্য ক্যানসার ওঁকে ধরেছে। ওঁকে সারিয়ে তোলাটা এখন পৃথিবীর সেরা ডাক্তারদেরও সাধ্যের বাইরে।

উনি শুধু জানতেন না—পৃথিবীর পাঁচশো কোটি লোকের শুধু একজনই পারতো—শরীরের মধ্যেকার এক অজানা শক্তির ভাণ্ডারের মুখ খুলে দিয়ে ওকে সারিয়ে তুলতে। কিন্তু হায়, সে লোকটাও তো এতক্ষণে সকলের নাগালের বাইরে চলে গেছে!

মতামত

ফ্রেডারিক পল ও সি. এম. কর্ণব্লাথ

হ্যারী ভন্নাদেক-এর বিরাট শরীরটার তুলনায় তার ভক্সওয়াগেন গাড়িটাকে নেহাত ছোটই বলতে হয়। হ্যারীর অবশ্য কী বা করার আছে? বেচারার আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে হাল-মডেলের নতুন একটা গাড়ি কেনে। ছোট্ট ভক্সওয়াগানের ব্রেক চাপলেই 'ক্যাচ্' করে একটা আওয়াজ হয়; স্কুলবাড়িটার সামনে গাড়িটাকে পার্ক করার সময় অমনি আওয়াজ হলো বার কয়েক। হ্যারী অবশ্য তখন ডাক্তার নিকলসনের কথাগুলো নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন।

খাটো-বুদ্ধির ছেলেমেয়েদের জন্য এ অঞ্চলে ঐ একটাই স্কুল। স্কুলের ছাত্রছাত্রী আর শিক্ষকদের মিটিং আজ। বড় হলঘরটায় যে জনাকুড়ি মানুষ জড়ো হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হ্যারী চিনতে পারলো শুধু স্কুলের প্রিন্সিপাল মিসেস অ্যাডলারকেই। ভদ্রমহিলা একজন সাদাচুলওয়ালা লোকের সংগে নিচুগলায় কী নিয়ে যেন আলোচনা করছেন। আচ্ছা, এই মুহূর্তে কি ওঁর সঙ্গে গিয়ে কথা বলাটা ঠিক হবে? হ্যারী মনে মনে ভাবলো।

এখন বিকেল পাঁচটা। অভিভাবকরা একে একে ঘরে ঢুকছেন। হ্যারী বিষণ্ণ মুখে চারধারে তাকায়। ঘরে দুটো বড় ঝাড়বাতি রয়েছে, দূরে একটা ফায়ার প্লেস; জানলা দিয়ে একটা খেলার মাঠ নজরে আসে।

একটু সরে বসবেন?

মহিলাকণ্ঠের আওয়াজে হ্যারী চমকে ওঠে। চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন দু'জন—স্বামী-স্ত্রী হবেন নিশ্চয়ই। ভদ্রমহিলার মুখে মৃদু হাসির রেখা।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।--বলেই বেশ কয়েকটা চেয়ার সরে বসে হ্যারী।

ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা নিচুগলায় কথা শুরু করেছেন। ওঁরা নিশ্চয়ই নিজেদের ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে আলোচনা করছেন, হ্যারী ভাবে। সংগে সংগে নিজের ছেলে টমাসের মুখটা ভেসে ওঠে চোখের

সামনে। ন'বছর বয়স হল ; ছেলেটা এখনো ভাল করে কথাই বলতে পারে না। হ্যারীর চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করে।

আপনার কেউ কি এই স্কুলে পড়ে নাকি ?—পাশের ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ ; আমার ছেলে।—হ্যারীর মুখে ম্লান হাসি ফোটে ঃ এ বছরই ভর্তি করেছি।

আমাদের ছেলেকেও তো এবারই ভর্তি করলাম।—পাশের ভদ্রলোক খানিকটা যেন উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই বলে ওঠেন ঃ আমরা অবশ্য এবছরই এজায়গায় এসেছি। এর আগে যেখানে ছিলাম সেখানকার লোকেরা বলতো—ওকে দেখে নাকি 'জড়বুদ্ধি' বলে মনেই হয় না।

হ্যারী চুপচাপ কথাগুলো শুনে যায়। ভদ্রলোক বলেন,—আরে আমার পরিচয়টাই তো দিইনি। আমার নাম 'মারে'—মারে লোগান ; আর এই আমার স্ত্রী 'সিলিয়া'। তা, এ স্কুলটা মন্দ নয়, কী বলেন ?

তাই তো মনে হয়।—হ্যারী হাসিমুখে জবাব দেয়।

ভার্ন, মানে আমার ছেলেও বলে—স্কুলটা নাকি ওর ভালই লাগছে।—মারে লোগান প্রায় ফিস ফিস করে বলে ওঠেন ঃ আপনার ছেলে কী বলে ?

আমার ছেলে কথাই বলতে পারে না।—বিষণ্ণ গলায় বলে ওঠে হ্যারী ঃ মস্তিষ্কে জন্মগত দোষ ; মিসেস অ্যাডলার অবশ্য আশা দিয়েছেন—চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে ওকে নিয়ে নাকি কিছু কিছু কথা বলানো যাবে।

এবার বোধহয় মিটিংটা শুরু হবে।—পাশের ভদ্রলোক সামনের দিকে ঝুঁকে বসেন। হ্যারী দেখে, স্কুলের প্রিন্সিপাল তাঁর ভারী শরীরটা নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছেন।

যাঁদের আজ আসবার কথা, আশাকরি তাঁরা সকলে এসে গেছেন। —মিসেস অ্যাডলার তাঁর ভাষণ শুরু করেন।

হ্যারীর মনে পড়ে, ভদ্রমহিলার সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা হয়েছিল সেদিনটার কথা। স্ত্রী মার্গারেটও সেদিন ছিল হ্যারীর সঙ্গে। টমীর বয়স তখন বছর দুই কি আড়াই। মিসেস অ্যাডলার সেদিন অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন ওকে। তারপর একটা ওষুধের নাম লিখে তিনমাস ধরে খাওয়াতে বলেছিলেন। না, ঐ ওষুধে অবশ্য টমাসের কোনও পরিবর্তন হয়নি ; পরেরবার দেখা করতেই টমাসের নামটা ওয়েটিং লিস্ট-এ তুলে নিয়েছিলেন মিসেস অ্যাডলার। সেও তো

প্রায় ছ বছর আগের কথা। মিসেস অ্যাডলারের স্কুলে জায়গা পেতেই এতগুলো বছর কেটে গেল।

এটাই আমাদের এ বছরের প্রথম মিটিং।—স্মৃতির পাতা থেকে সরে এসে মিসেস অ্যাডলারের কথাগুলোয় মন দেয় হ্যারী ঃ ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে আপনাদের কি কোন অসুবিধে হচ্ছে?

একজন বয়স্ক লোক উঠে দাঁড়ান। অন্ততঃ বছর ষাটেক বয়স তো হবেই। জামা-কাপড়ের বাহার দেখে ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থাটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের যেসব সুযোগ-সুবিধে পাওয়ার কথা—আমাদের ছেলেমেয়েরা কি তা পাচ্ছে? আমাদের সরকারের কি এই স্কুলকে একটা মোটর-বাস কিনে দেওয়াটা উচিত নয়? ছেলেমেয়েরা স্কুল-বাসে আসা যাওয়া করলে আমাদেরও তো আর চিন্তা থাকে না, কী বলেন?—সমর্থনের আশায় ভদ্রলোক এদিক ওদিক তাকান।

সরকার কিসসু করবে না।—এক মহিলা রাগী গলায় বলে ওঠেন ঃ সরকারের কাছে তো কম আবেদন-নিবেদন করা হয়নি। আমাদের এখন খবরের কাগজে চিঠি পাঠান দরকার!

—'উঁহু! আমার মনে হয়—আমাদের এই স্কুলটার আসলে পাবলিসিটির অভাব রয়েছে। মিসেস অ্যাডলার এই স্কুলের বাচ্চাদের জন্য যা করেছেন তা যদি ভালভাবে প্রচার করা যায়, তবে নিশ্চয়ই অনেকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন।'

হ্যারী জানে, এ ধরনের আলোচনার কোনও শেষ নেই। মারে লোগান হঠাৎ হ্যারীর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলে,—প্রথমে যিনি বলতে উঠলেন—ওকে চেনেন নাকি?

—না তো।

—শুনেছি এই স্কুল-বাড়িটা তৈরির টাকা দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। ও'র মেয়েটাতো প্রথম থেকেই রয়েছে এ স্কুলে। মোটাসোটা, গোলগাল চেহারা—দেখেননি ও'কে?

হ্যারী মনে করার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে আলোচনার বিষয়-বস্তু পালটেছে। হ্যারী শুনতে পায়—স্কুলের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য চাঁদা তোলার কথা হচ্ছে।

আচ্ছা আমরা তো অনায়াসেই একটা গানবাজনার জলসা করতে পারি, কি বলেন?—একজন রোগা মহিলা বলে ওঠেন ঃ আমরা যদি

একেক জন বিশ-তিরিশটা টিকিট বিক্রি করে তবেই তো বেশ কিছু টাকা উঠে আসে।

আমরা কে কত টিকিট নেবো তা এখন জানিয়ে দিতে কি কোন বাধা আছে?—আর একজন উৎসাহী মানুষ প্রশ্ন করেন।

আমার নাম হ্যারী ভ্লাদেক।—হ্যারী উঠে দাঁড়ায়ঃ এ অঞ্চলে আমি নতুন এসেছি, কাউকেই তেমন চিনি না। আমি বোধহয় গোটা দশেকের বেশি টিকিট বেচতে পারবো না।

—এটা ঠিকই যে আমাদের অনেকের পক্ষে তিরিশজন খদ্দের যোগাড় করা বেশ মুশকিল; তবে কিনা এটা আমাদের একটা সামাজিক দায়িত্ব। সেটা মনে রেখেই আমাদের চেষ্টা চালাতে হবে।



এ প্রসঙ্গে আপনাদের একটু মনে করিয়ে দিইঃ—স্কুলের একজন শিক্ষক বলতে থাকেনঃ এখানে একজন সাইকোলজিস্ট নেওয়া দরকার। বাচ্চাদের কথা বলার ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আরও একজন স্পিচ্-থেরাপিস্ট চাই; স্কুলবাড়িটা একবার রঙ করাও দরকার; এসবের জন্য বাড়তি টাকাটা নিশ্চয়ই আপনাদের কাছ থেকে আদায় করা যায় না। মানে, স্কুলের মাইনে বাড়াতে যে আমরা মোটেই আগ্রহী নই তাতো আপনারা জানেনই।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মিসেস অ্যাডলার আবার উঠে দাঁড়ান।

—আপনারা সবাই যে এই স্কুলের উন্নতির জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন, এতে যে আমার কী আনন্দ হচ্ছে। আপনাদের এটুকু বলতে পারি—আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি। আপনাদের ছেলেমেয়েদের অনেকেই এখন সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশা করছে ; কেউ কেউ অন্যদের সঙ্গে খাবারদাবার ভাগ করে খাচ্ছে। এই তো আমার সামনেই রয়েছেন মিস্টার আর মিসেস লোগান। আপনাদের ছেলে তো দারুণ মিশুকে !

সত্যি ?—মারে লোগান উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন—শুনছো গো, আমাদের ভার্ন-এর কথা বলছেন।

হ্যারী ভল্লাদেক দাঁড়িয়ে ওঠে। এবারে বাড়ি ফেরা দরকার। মার্গারেট ওর ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে।

আরে উঠে পড়লেন যে ? কফি আসছে আমাদের জন্য।—মিসেস লোগান বলে ওঠেন।

—আজ্ঞে, আমার বাড়ি এখান থেকে প্রায় ঘন্টা খানেকের রাস্তা। আমাকে মাফ করবেন।

মিসেস অ্যাডলার হ্যারীর দিকে এগিয়ে আসেন,—কেমন লাগলো আজকের মিটিংটা ?

না, আমি আসলে এসেছিলাম একটা বিষয়ে আপনার একটু পরামর্শ নিতে।—হ্যারী আমতা আমতা করে বলে ঃ আচ্ছা, আমাদের টমী কি কোনদিনই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে না ?

—আমি তো আগেই বলেছি—কোন মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে ম্যাজিকের সাহায্যে আমরা সুস্থ স্বাভাবিক করে তুলতে পারি না। এখানে থাকলে আপনার টমীর খানিকটা উপকার নিশ্চয়ই হবে ; তবে আপনাদেরও ওর অসুবিধেগুলো বুঝতে হবে।

—সারাজীবন ধরেই তাহলে বেচারাকে আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে ? যেদিন আমরা থাকবো না, সেদিন কী হবে ওর ?

হ্যারীর প্রশ্নের কোন উত্তর যোগায় না মিসেস অ্যাডলারের মুখে।

হ্যারী রাস্তা থেকেই দেখলো, মার্গারেট চুপচাপ বসে আছে জানলার ধারে।

—কেমন আছে ও ?

খারাপ নয়।—মার্গারেট অস্ফুট গলায় উত্তর দেয় ঃ একা শুতে চাইছিল না ; ওর পাশে গিয়ে শুতে তবে ঘুমলো।

হ্যারী জুতোর ফিতে খোলে।

ডাক্তার নিকলসন আবার ফোন করেছিলেন।—মার্গারেট জানায়।

—তোমাকে বিরক্ত করতে বারণ করেছিলাম।

—না, না, বিরক্ত করবেন কেন? ভদ্রলোকের কথাবার্তা তো খুবই বিনীত। আমি বলেছি, বাড়ি ফিরেই তুমি ওঁকে একটা ফোন করবে।

আজ রাত হয়ে গেছে মার্গারেট। কাল সকালে দেখা যাবে।—শোবার ঘরের দিকে এগোয় হ্যারী।

না, তা হয় না।—মার্গারেটও উঠে দাঁড়ায় ঃ এখনই তোমার ওঁর সঙ্গে কথা বলা উচিৎ। তুমি বুঝতে পারছো না, আজ রাতেই উনি আমাদের মতামতটা জানতে চান।

রাতের মধ্যেই জানতে চান?—উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে হ্যারী ঃ তুমি আমায় কী করতে বলো? আচ্ছা, এতবড় একটা ব্যাপারে এমন চট্ করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়?

—আমি তোমায় কোন চাপ দিচ্ছি না। কিন্তু ওঁদেরও তো হাতে সময় নেই। তোমার মতামতের ওপর যে অনেক কিছু নির্ভর করছে।

হ্যারী হতাশ চোখে মার্গারেটের দিকে তাকায়। কফির কাপটা হ্যারীর দিকে এগিয়ে দিয়ে মার্গারেট ধীরে ধীরে বলে,—আমরা কিন্তু ওঁদের প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলাম। তুমি শুধু মিসেস অ্যাডলারের সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে চেয়েছিলে।

—হ্যাঁ, কথা বলেছি। উনি অবশ্য কোন ভরসা দেননি।

সে তো জানতামই। তবে আর কিসের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করছো তুমি? মার্গারেটকে অধৈর্য দেখায়।

ক্রিং ক্রিং করে ফোন বাজে। নিশ্চয়ই ডাক্তার নিকলসন—বলে ওঠে মার্গারেট।

হ্যারী ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরে। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে,—আমি এখনো কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি, ডাক্তার। আপনি কি বড্ড বেশি তাড়া দিচ্ছেন না?

কি করবো? পরিস্থিতিটাই এমন,—ফোনের মধ্যে ডাক্তারের কথাগুলো কেমন করুণ শোনায় ঃ ছেলেটার হৃৎপিণ্ড থেমে গেছে এক ঘন্টা আগে—

তার মানে, ছেলেটি মারা গেছে?—হ্যারী চেঁচিয়ে ওঠে।

মারা গেছে, বলি কি করে? হার্ট-লাঙ্ মেশিন দিয়ে এখন ওর শ্বাস প্রশ্বাসের কাজটা চালানো হচ্ছে। আমরা এ অবস্থায় ওর শরীর আর মস্তিষ্ককে ষোল-আঠার ঘন্টার বেশি অবশ্য বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না। আপনাদের জন্যে প্লেনের তিনটে সীট রিজার্ভ করে রেখেছি। আপনারা যদি আর দেরি না করেন তবে ঘন্টা তিনেকের মধ্যে এখানে পোঁছবেন। তারপরও অবশ্য খানিকটা সময় হাতে থাকবে —তবে তা অবশ্যই খুব বেশি নয়।

আমি কিছু ঠিক করতে পারছি না। আমার মাথায় কিচ্ছু আসছে না। কী বললাম বুঝতে পারছেন?—হিস্টিরিয়া রোগীর মতন চেঁচাতে থাকে হ্যারী।

আপনি একটু শান্ত হোন, মিস্টার ভল্লাদেক।—ডাক্তার নিকলসনের স্থির কণ্ঠস্বর ভেসে আসে ঃ আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। তবু একবার এখানকার এই ছেলেটির বাবা-মা'র কথাটা চিন্তা করুন। ওঁরা শুধু চান—ওঁদের মৃত সন্তান আবার আপনাদের টমীর মধ্যে বেঁচে উঠুক। আপনি তো জানেন ওঁদের ঐ ছেলেটি কি অসাধারণ বুদ্ধিমান আর চনমনে স্বভাবের ছিল। এমন একটা দুর্ঘটনায় না পড়লে ছেলেটি যে একদিন সকলের নজর কাড়তো তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আপনি লোভ দেখাচ্ছেন?—হ্যারীর স্বর রীতিমতো ক্রুদ্ধ শোনায় ঃ আমার হাবাগোবা টমীর বদলে আমি নেব একটা বুদ্ধিমান, হাসিখুশি ছেলেকে—এই তো?

—না, আমি শুধু বলেছিলাম—আপনি ইচ্ছে করলে একটা চৌকস, মেধাবী ছেলেকে বাঁচাতে পারেন।

কিন্তু আপনি কি গ্যারান্টি দিতে পারেন—আপনার অপারেশন পুরোপুরি সফল হবে?—হ্যারীর যেন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে।

তা পারি না।—নিঃসঙ্কোচে বলেন ডাক্তার ঃ তবে আপনাকে তো এর আগে আমাদের যাবতীয় এক্সপেরিমেন্টের কথা বলেছি। শিম্পাঞ্জী-গরিলাদের ক্ষেত্রে একজনের মস্তিষ্ক অন্যের খুলির ভেতর বসাতে আমরা সক্ষম হয়েছি। মানুষের মস্তিষ্ক বদলের চেষ্টা অবশ্য আগে হয়নি তবে যেভাবে আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি তাতে আমাদের বিফল হবার সম্ভাবনা কম। আপনাকে তো আগেই বলেছি, মিস্টার রবার্টের ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট হবার পর আমরা যখন বুঝলাম ওর আয়ু মাস কয়েকের বেশি নয়—তখন থেকেই গোটা দেশের জড়বুদ্ধি ছেলেদের বায়োডাটা ঘাঁটতে শুরু করি আমরা। শেষ পর্যন্ত মিস্টার রবার্টের

ছেলের শারীরিক গড়ন গঠন আপনার টমীর সঙ্গে হুবহু মিলে যাওয়ার পরই আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। আমার বিশ্বাস, টমীর শরীর নতুন একটা মস্তিষ্ক গ্রহণে কোনরকম আপত্তি দেখাবে না।

একনাগাড়ে কথাগুলি বলে ডাক্তার নিকলসন থামেন। হ্যারী কী বলবে বুঝতে পারে না।

—কিছু বলুন মিস্টার ভল্লাদেক।

আমাকে অন্ততঃ আধ ঘন্টা সময় দিন।—বলেই ফোনটা নামিয়ে রাখে হ্যারী।

কফিটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কাপটা নাড়াচাড়া করতে করতে হ্যারী ভাবে—দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাক্তার বার্নার্ড মানুষের হৃৎপিণ্ড বদলে দিয়েছিলেন। কিডনি, চোখ, শরীরের অন্য সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-বদল তো এখন নিত্যকারের ঘটনা। কিন্তু তাই বলে—একজনের অপরিণত মস্তিষ্ক কেটে বাদ দিয়ে অন্য একটা মস্তিষ্ক বসিয়ে দেওয়া! ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে হ্যারীর।

মার্গারেট এসে কাঁধে হাত রাখে,—চলো, ওপরে টমীর ঘরে যাই।

আমরা তাহলে শেষপর্যন্ত ওকে খুন করতে চলেছি, কি বলো? —বিড়বিড় করে বলে ওঠে হ্যারী।

এভাবে বলছো কেন? আমি তো তোমাকে শুধু টমীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে বলেছি। টমীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা ঠিক করবো —ওর মস্তিষ্ক পালটে ফেলবো কিনা।—মার্গারেটের চোখে জল।

একটা একটা করে সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে টমীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ওরা। ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর এক টমীর মুখ ভেসে ওঠে হ্যারীর চোখের সামনে। জবুথবু, বুদ্ধি-হীন মুখের বদলে বুদ্ধিদীপ্ত, চঞ্চল একটা ছোট্ট ছেলের মুখ। সেই ছেলেটা দৌড়চ্ছে, খেলছে, বাবা-মা'র সঙ্গে অনর্গল কথা বলছে, কার্ড-বোর্ডের টুকরো দিয়ে এরোপ্লেন বানাচ্ছে....

আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে ড্রয়িংরুমে রাখা টেলিফোনটার কাছে এগিয়ে যায় হ্যারী।

ক্ষুদে উদ্যোগ

উইলিয়াম লী

আমার ক্ষুদে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটা উদ্যোগী দল খুললে কেমন হয়?—খেতে বসে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম আমার স্ত্রী মার্জোরীর দিকে।

মন্দ হয় না।—মার্জোরী মুচকি হেসে জবাব দিলো: তবে কিনা উদ্যোগী-দল বলতে কি বোঝাচ্ছো সেটা জানা দরকার। তাছাড়া কিভাবে এইসব আইডিয়া তোমার মাথায় এলো তা যদি একটু বুঝিয়ে বলো!

না, আইডিয়াটা অবশ্য আমার নিজের নয়।—আমার নিঃসঙ্কোচ স্বীকারোক্তি: আমাদের স্কুলের প্রিন্সিপাল মিস্টার ম্যাক্‌করমিক আজ ঘরে ডেকে বললেন—নীচুক্লাসের কয়েকটা ছেলেমেয়ে নাকি এ ধরণের একটা দল গড়তে চেয়েছে এবং আগামী গ্রীষ্মের ছুটিতে ওরা কিছু করতে চায়। ওরা নিজেরাই নাকি আমাকে ওদের গাইড হিসেবে পেতে চেয়েছে।

পাঠকদের আমার পরিচয়টা জানানো দরকার। আমার নাম ডোনাল্ড হেন্ডারসন; রিজ্‌ভিল হাই-স্কুলে অংক আর ফিজিক্স পড়াই। রিজ্‌ভিল স্কুলের যথেষ্ট সুনাম আছে; বুদ্ধিমান-চৌকস ছেলেমেয়ে ছাড়া এ স্কুলে ভর্তি হতেই পারে না কেউ।

তা, তোমার উদ্যোগী-দল কী করবে সেটা তো বললে না।—পাউরুটীতে মাখন মাখাতে মাখাতে আমার দিকে আড়চোখে তাকায় মার্জোরী।

এই ধরো, ছুটির সময় যখন পড়াশুনোর তেমন চাপ নেই তখন ওরা হয়তো 'কাপড়-কাচা সাবান' কিংবা 'মেঝে চকচকে করার পালিশ' তৈরী করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করলো। এতে ব্যবসা সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠবে ওদের মধ্যে। তাছাড়া এভাবে কিছু টাকা-পয়সা রোজগার হলে ভবিষ্যতে পড়াশুনো চালাবার ব্যাপারেও খানিকটা সাহায্য হতে পারে।

হায়, হায়—শেষ পর্যন্ত তোমার কাছ থেকে ব্যবসার তালিম নিতে হবে?—মার্জোরী হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে: আহা বেচারারা।

হেসে নাও, যত পারো হেসে নাও।—আমি কপট রাগের ভঙ্গী করি ঃ আমার ছেলেমেয়েরা যখন সত্যি সত্যি চুটিয়ে ব্যবসা করবে তখন তোমার চোখ দুটো যে ছানাবড়া হবে তা এই বলে রাখলাম। জানো—মিস্টার ম্যাক্‌করমিক নিজের পকেট থেকে পঞ্চাশ ডলার দিয়েছেন? তারপর, মিস্টার উইলিস্ বলে যিনি আমাদের হিসাবপত্র রাখেন, তিনিও তাঁর বাড়ির লাগোয়া আউট হাউসটা ছেড়ে দিয়েছেন আমাদের কারখানা বানানোর জন্য। ওঁর বাড়িটা অবশ্য শহরের একটু বাইরে, তবু বেশ নিরিবিলি জায়গা বলতে হবে। এই কদিন পরেই তো ছুটি শুরু হচ্ছে। তুমি দেখে নিও—আমরা সত্যি সত্যি নেমে পড়ি কিনা।

আমার স্ত্রী চুক্‌চুক্ করে হেসে বলে,—বেশ বেশ, তুমি কত্তবড় কাজের লোক এবারে তার প্রমাণ পাবো।

সপ্তাহ তিনেক পরে বুধবারের এক সকাল। আমি বসে আছি এক আগাছা ভর্তি বাগানের একটা গাছের গুঁড়ির ওপর। আমার সামনে একটা নড়বড়ে কাঠের টেবিল। টেবিলের ওপারে বসে আছে পাঁচটি ছেলে-মেয়ে—আমাদের উদ্যোগী-দলের পাঁচ সদস্য। ডরিস এনরাইট, পিটার কোপ আর হিলারী ম্যাটল্যাক—ওদের তিনজনেরই বয়স দশ বছর। সাদা ফ্রক পরা ডরিসকে দেখাচ্ছে ঠিক একটা ফুল-পরীর মতন। পিটার আর হিলারী—দুজনেই রোগা প্যাঁকাটে, কিন্তু দুজনেরই চোখ দারুণ ধারালো। ওদের থেকে একটু দূরে বসে আছে মেরী ম্যাক্‌ক্রিডী আর টমী মিলার। ওরা পড়ে দু'ক্লাস উঁচুতে—বয়স বছর বারো। মেরী তো সবসময় হাসছে ; ওর হাসিটাও কেমন ছোঁয়াচে! থেকে থেকে ওর দিকে তাকিয়ে অন্যেরাও দেখি হাসি চাপার চেষ্টা করছে। টমী আবার ভীষণ ছট্‌পটে ; এক জায়গায় দু-মিনিট স্থির হয়ে বসে থাকাটা ওর ধাতে নেই!

ইয়ে, এটা আমাদের প্রথম মিটিং।—আমি ওদের সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে বক্তব্য শুরু করি ঃ

এই ছুটির দিনগুলিতে আমাকে তোমাদের মাস্টারমশাই বলে না ভাবলেও চলবে। মাঝে মাঝে তোমাদের কাজকর্মে একটু পরামর্শ দিতে পারি। তোমাদের উদ্যোগগুলো লাভজনক হবে কিনা তা বলে দিতে পারি—তবে ঐ পর্যন্তই। যা কিছু তৈরী করার তোমরাই করবে ; লাভ যা হবে সেও তোমাদেরই।

ছেলেমেয়েগুলি যে খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছে

এমনটা মনে হলো না। বললাম,—এবার তাহলে কাজে নেমে পড়া যাক। তোমরা কে কি বানাতে চাও, বলে ফ্যালো একে একে।

ব্রণ'র দাগ তোলার ওষুধ বানালে কেমন হয়? মানে, আমার নিজেরই গালভর্তি ব্রণ'র দাগ কিনা ; ঐ ওষুধের আমিই তাহলে প্রথম খদ্দের হতাম।—হাসি হাসি মুখেই বলে ওঠে মেরী।

মেয়েটি আমার সঙ্গে রসিকতা করছে কিনা তা যাচাই করার জন্য ওর মুখের দিকে তাকাতেই আমার মনে পড়লো স্কুলের প্রিন্সিপাল মিস্টার ম্যাক্‌করমিকের কথাগুলি। ভদ্রলোক আমার পকেটে পঞ্চাশ ডলার গুঁজে দেবার সময় বলেছিলেন,—যে পাঁচটা ছেলেমেয়ে ঐ উদ্যোগী-দলটা গড়তে চাইছে, ওরা প্রত্যেকেই যাকে বলে অসাধারণ বুদ্ধিমান ; আই-কিউ কারোরই একশো চল্লিশের নীচে নয়। ওদের দিয়ে আপনি হয়তো অনায়াসেই ভাল-কোয়ালিটির সাবান কিংবা নাট-বল্টুর মরচে তোলার জন্য নতুন ধরনের তেল বানাতে পারবেন।...।

মেরীর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিতেই টমী বল্‌-বিয়ারিং বানানোর প্রস্তাব দিল। ওর ধারণা—এ অঞ্চলের কলকারখানায় নাকি ঐ বস্তুটির প্রচণ্ড চাহিদা রয়েছে।

বললাম,—বল্‌-বিয়ারিং বানাতে গেলে একটা হাইড্রলিক প্রেস চাই, যার দাম নিদেন পক্ষে হাজার দশেক ডলার। সুতরাং অন্য কিছু বানানোর কথা ভাবো।

তাহলে ইলেকট্রনিক্সের নতুন কিছু।—পিটার দ্বিধা জড়ানো গলায় বলে ওঠে।

নতুন ধরনের ডিটারজেন্ট-সাবান বানালে কেমন হয়?—পিটারকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে হিলারী ঃ মানে, আমি বলছি এমন এক ডিটারজেন্টের কথা যা কিনা আমাদের এই রিজ্‌ভিলের লোহা-ভর্তি খর জলেও দেদার ফেনা তুলবে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি গলা-খাঁকারি দিই ঃ তোমরা যেসব জিনিসের কথা বলছো। সেগুলি এই মুহূর্তে বানানোর মতো জায়গা বা আর্থিক মূলধন আমাদের নেই। বলা যায় না, যদি আগামী দু-তিনটে গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা কাজ চালিয়ে যেতে পারি তবে হয়তো পরে তোমাদের ঐসব বল্‌বিয়ারিং, হাই-ফাই ইলেকট্রনিক্স কিংবা নতুন ধরনের ওষুধ বা ডিটারজেন্ট পাউডার বানাতে পারবো।

মিস্টার হেন্ডারসন, যদি বলেন তো আমরা ওসব কারিগরী দিকে না গিয়ে ইঁদুরছানা-উৎপাদনের ব্যাপারে উৎসাহ নিতে পারি।—

ডরিস এতক্ষণে মুখ খোলে ঃ একাজটা বেশ কিছুদিন ধরে বাড়িতে বসে আমি করে আসছি কিনা।

—ইঁদুরের বাচ্চা? তুমি কি সংকর জাতের ইঁদুর বানিয়েছো নাকি?

নিশ্চয়ই।—স্বাভাবিক গলায় জবাব দেয় ডরিস ঃ ইঁদুররা তো, জানেনই, চট্‌পট্‌ বড় হয় আর বাচ্চা দেয়। ইঁদুরের বাচ্চা—তার আবার বাচ্চা—এইভাবে আমার ইঁদুরগুলো এখন সতেরো-পুরুষে এসে ঠেকেছে!

ইঁদুরগুলি কি বেশ নাদুস-নুদুস? তাহলে অবশ্য ল্যাবরেটরীগুলি কিনতে পারে।—আমি কিঞ্চিৎ উৎসাহিত বোধ করি।

না, না—ওগুলো ল্যাবরেটরীতে বসে কাটা-ছেঁড়া করার মতো জন্তু নয়,—ডরিস হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে ঃ আপনি আমার ইঁদুরগুলো দেখেননি বলেই ওকথাটা বলতে পারলেন। গায়ে ওদের লাল ডোরাকাটা দাগ; দেখলেই আপনার পুষতে ইচ্ছে করবে। জানেন, ওদের গায়ের ঐ রং আর ডোরাকাটা দাগগুলো আনতে আমাকে ওদের বেশ কয়েক পুরুষ ধরে জিন্‌ পরিবর্তনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে? ওগুলো সব দারুণ সখের জীব।

লাল ইঁদুরের তেমন চাহিদা আছে বলে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না। আমি ইতস্ততঃ করে বলি ঃ তার চেয়ে বরং তোমরা আফ্‌টারশেভ-লোশন বানাও না। এর জন্য চাই সামান্য একটু অ্যালকোহল, একটু গ্লিসারিন, জল, কোন একটা রাসায়নিক রং আর ভুরভুরে গন্ধওয়ালা সেন্ট। বোতলের মধ্যে বস্তুটি পুরে ছাপানো লেবেল লাগিয়ে দিলেই ব্যাস!

কিভাবে বিক্রি করা হবে ওটা?—টমী জানতে চায়।

—কেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেচতে অসুবিধে কোথায়?

উঁহু, তার চেয়ে বরং এমন জিনিস বানানো যাক যা খদ্দেররা এসে সাধাসাধি করে নিয়ে যাবে।—টমী আমার প্রস্তাব এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেয় ঃ আপনি তো আফটার্‌-শেভ-লোশনে রং মেশানোর কথা বলছিলেন; আচ্ছা এমন রং বানালে হয় না—যা দিয়ে শরীরের রং বরাবরের জন্য তামাটে করে নেওয়া যায়? লোককে তখন পয়সা খরচ করে সমুদ্রতীরে গিয়ে রোদ্দুরে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে হবে না।....

মিস্টার উইলিসের বাড়ির ভেতর থেকে ঝুড়িতে করে স্যান্ডউইচ আর আপেল আসে। লাঞ্চের এই বন্দোবস্ত অবশ্য আগে ভাগেই করে রাখতে হয়েছে। স্যান্ডউইচে কামড় দিতে দিতে আমরা আমাদের

নতুন কোম্পানীর কী নাম দেওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করলাম এবং বলা বাহুল্য, কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেল না।

শেষ পর্যন্ত ঘুড়ি বানানোর প্রস্তাব এলো মেরীর কাছ থেকে।

তাই শুনে পিটার বললো,—নতুন ধরনের ঘুড়ি বানালে মন্দ হয় না। ধরা যাক, ঘুড়িটা হবে মোজা'র মতো দেখতে—বলেই পিটার মাটির ওপর কাঠি দিয়ে ঘুড়ির ডিজাইন আঁকলো, ঃ ঘুড়ির নিচে একটা ফুটো রাখতে হবে—না হলে ঘুড়ি উড়বে না।

ডরিস বললো,—আমি না হয় রাত্রে বাড়িতে বসে ঐ রকম একটা ঘুড়ি বানাবো, কাল আমরা এখানে এসে পরীক্ষা করে দেখবো —ঘুড়িটা ওড়ে কিনা।

ভাবলাম, এইসব ক্ষুদে কারিগররা যা প্রাণ চায় করুক· পরে ওদের ভুলত্রুটিগুলো না হয় শুধরে দেওয়া যাবে।

রাত্রে খেতে বসে সারাদিনের আলাপ-আলোচনার কথাই ভাব-ছিলাম। ছেলেমেয়েগুলো যেসব জিনিস বানানোর প্রস্তাব দিয়েছে তা এই মুহূর্তে বানানো সম্ভব না হলেও—ওগুলোর মধ্যে যে বেশ অভিনবত্ব আছে সেটা মানতেই হয়। যেমন টমী একবার টুথপাউডারকে ট্যাবলেট হিসেবে তৈরি করার প্রস্তাব দিলো। দাঁত ব্রাশ করার আগে ঐ রকম একটা ট্যাবলেট মুখে পুরে নিলেই গোটা মুখটা ফেনায় ভরে যাবে। পিটার এমন একটা জিনিস তৈরির প্রস্তাব দিলো যা একাধারে স্ক্রু এবং পেরেকের কাজ করতে পারে। হিলারীর মতে—এমন এক ধরনের প্লাস্টিকের চাকতি বানালে হয় যার পর কালো রং বুলিয়ে শীতের দিনে বাড়ির সামনে রেখে দিলে—সেগুলি সূর্যের তাপ শুষে নিয়ে নিচের বরফ গলিয়ে দেবে। শীতের দিনে যাঁদের বাড়ির সামনে বরফ জমে বেরনোর পথ থাকে না—তাঁদের আর গাঁইতি-বেলচা নিয়ে বরফ কাটার কষ্ট পোয়াতে হবে না।

পরের দিন সকালে মিস্টার উইলিসের বাগান বাড়িতে গিয়ে যখন আকাশে এক ঢাউস মোজাকে উড়তে দেখলাম—নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। ঘুড়ির সরু প্রান্তে ত্যারছাভাবে ছ্যাদাটা বানিয়েছে—ফলে আকাশে ভেসে বেড়াতে কোন অসুবিধেই হচ্ছে না ঘুড়িটার।

টমীকে দেখছি না যে।—ডরিসকে জিজ্ঞাসা করি।

—ও গেছে ব্যাংকে। ব্যবসার মূলধন তো দরকার। তা এই ধরনের কয়েকশো ঘুড়ি বানাতে গেলেই তো শ-খানেক ডলারের ধাক্কা!

—ব্যাংক কেন ? আমি আর মিস্টার ম্যাক্‌করমিক তো তোমাদের কিছু টাকা ধার দিতে পারি—গতকালই তো বলেছিলাম সেটা।

—আপনার কি মনে হয় না, ব্যাংক থেকে ধার করাটাই বেশী যুক্তিসংগত ? ব্যবসার জন্য সকলে তো ব্যাংক থেকেই ধার নিয়ে থাকে।

ডরিসের কথা শেষ হতে না হতেই টমী হন্তদন্ত হয়ে ফিরে আসে ; আমার হাতে একটা চেকবই গুঁজে দিয়ে বলে,—আড়াইশো ডলার পাওয়া গেল। আপনি তো গতকাল আমাদের কোন প্রস্তাবেই সায় দিলেন না—অথচ ব্যাংকের লোকগুলো মোজা-ঘুড়ি আর



ডিটারজেন্ট বানানোর পরিকল্পনায় কত উৎসাহ দেখালো। ধার পেতেও কোন অসুবিধা হয়নি। ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা অবশ্য আপনারই নামে। ফেরার পথে একবার ব্যাংকে গিয়ে আপনার নমুনা সইটা দিয়ে আসবেন।

আমার বুকের ভেতর কে যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে। আড়াইশো ডলার হলো আমাদের পনেরো দিনের মাইনে। ওদের পরিকল্পনা যদি ব্যর্থ হয় তবে তার মাশুল গুণতে হবে আমাকেই।

ও হ্যাঁ,—টমী কতকগুলো ঝকঝকে লেখার প্যাড আর সাদা

খাম এগিয়ে দেয় ঃ আমাদের কোম্পানীর লেটারহেড বানাতে হবে। আমাদের এটার নাম দেওয়া যাক 'রিজ্ ইন্ডাস্ট্রীজ'—কী বলেন? জায়গাটার নামই যখন রিজ্‌ভিল।

কাগজের প্যাড আর নামগুলো হাতে নিয়ে বলি,—বেশ দামী কালিতে ছাপতে হবে তো?

নিশ্চয়ই।—ওরা সমস্বরে বলে ওঠে ঃ ব্যবসা বলে যখন কথা—

আমাদের ঘুড়ির কারখানা চালু হলো শুক্রবার সকালে। ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে কাজের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিল। বেলা বাড়তেই দেখি—ওদের একজন কাঠের টুকরোগুলো থেকে চোক্‌লা বের করছে। কেউ আবার ওগুলি রজনে ডুবিয়ে শক্ত করে তুলছে ; প্লাস্টিকের ফিল্মগুলিকে নানা আকারে কাটা হচ্ছে কাঁচি দিয়ে। ঘুড়ির ফ্রেমে কাগজ সাঁটছে আর একজন ; সিমেন্ট দিয়ে ঘুড়ির কোণগুলিকে সেঁটে দিচ্ছে আর একজন—

পরের বুধবার সকালের মধ্যেই তিনশো ঘুড়ি তৈরি হয়ে গেল। সবাই মিলে টমীকেই বিক্রি-বাটার দায়িত্ব দিয়েছে এবং টমীর বিশ্বাস—বাজারের চাহিদা মেটানোর মতো যথেষ্ট সংখ্যায় মজুত না হলে কোন জিনিসই বিক্রীর জন্য ছাড়া উচিত নয়। ঘুড়ির সংখ্যা তিনশোয় দাঁড়াতে টমীকে বেশ সন্তুষ্ট দেখলাম। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই ঘুড়িগুলোকে বাজারে ছাড়ার কথা ও জানিয়ে দিলো মেরীকে।

ঐ দিন আরও তিনটে ঘটনা ঘটলো—যার দুটো আমি সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলাম। মেরী সেদিনই ওর বাড়ি থেকে একটা পোর্টেবল টাইপ রাইটার নিয়ে এলো ; তারপর বেশ কিছু চিঠিপত্র ঝপাঝপ্ টাইপ করে আমাকে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিলো।

হিলারীও সেদিন আমাকে ওর তৈরি নতুন ডিটারজেন্ট দেখালো। বোতল থেকে হলদে রং-এর তরলের এক ফোঁটা বালতি-ভর্তি জলে ঢালতেই ফেনা উপচে পড়লো চারদিকে। আমাদের রিজ্‌ভিলের জলে যেখানে সাবান ঘষে ঘষে হাত ব্যথা হয়ে গেলেও ফেনা তোলা যায় না, সেখানে ঐ নতুন ডিটারজেন্টের ক্রিয়াকলাপ দেখে আমি তো হাঁ।

—কী দিয়ে বানালে এটা? কই আগে তো বলোনি, তুমি এসব বানাচ্ছো?

ওঃ, আপনি ফর্মুলাটা জানতে চাইছেন?—হিলারী আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে ঃ লরিল-বেনজিল ফসফোনিক অ্যাসিড, ডাই পটাশিয়াম সল্টের কুড়ি পার্সেন্ট সল্যুশন মিশিয়ে—

ব্যস্, ব্যস্।—আমি ওকে থামাই। কেমিস্ট্রির বই আমি শেষ উল্টেছি পঁচিশ বছর আগে।

বুধবারের তৃতীয় ঘটনাটা আমার কানে এলো বৃহস্পতিবার সকালে। আমাদের নতুন কারখানায় পৌঁছতে সেদিন আমার একটু দেরীই হয়ে গেছিল। দূর থেকেই দেখলাম—নিঃস্তব্ধ বাগানবাড়ীটার চারপাশে একেবারে লোকে লোকারণ্য! আধ মাইল দূর থেকে রাস্তায় সব গাড়ি দাঁড়িয়ে। কাছে যেতে দু'জন পুলিশও নজরে এলো।

কী ব্যাপার? এখানে এত ভীড় কিসের?—পুলিশ দুজনকেই যথাসম্ভব গাম্ভীর্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম।

আপনার নাম কি হেন্ডারসন?—ওদের একজন জিজ্ঞাসা করলো আমায়।

আমি সম্মতি জানাতেই হৈ হৈ করে উঠলো সকলে।

আমি মশাই কাগজের রিপোর্টার,—বলতে বলতে একটা রোগা প্যাংলা লোক আশেপাশের সবাইকে কনুই-এর গুঁতো দিয়ে হটিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো: এখানকার ব্যাপার-স্যাপারগুলো একটু খুলে বলতে কি কোন অসুবিধে আছে আপনার?

রিপোর্টারটি কাগজ-পেন্সিল বাগিয়ে ধরে।

এখানকার ব্যাপার-স্যাপার? কী বলছেন, আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!—আমার গলায় অকৃত্রিম বিস্ময়।

—ওঃ আপনি তাহলে জানেন না যে আপনার এক ছাত্র শহরের মাঝখানেই বড় ফোয়ারাটার জলে সাবানের গুঁড়ো ফেলে এসেছে গতকাল?

না, জানি না।—আমি প্রতিবাদ জানাই: আর যদি ফেলেও থাকে তাতে হয়েছেই বা কী?

বলেন কী?—একজন মোটা সোটা চেহারার বুড়ো হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে: হবার কি কিছু বাকী আছে? সাবানের ফেনা ফোয়ারার বাঁধানো দেয়াল উপচে শহরের সব রাস্তাগুলোকে ভাসিয়েছে!

রাস্তায় রাস্তায় এখন গাড়ীর জ্যাম; আর সে ফেনারও যেন শেষ নেই!—পুলিশদের একজন চেঁচিয়ে ওঠে: আমাদের থানায় আজ ভোরে কে একজন ফোনে জানালো—আপনার এখানে টমী মিলার নামে একটা ছেলে নাকি ঐ ডিটারজেন্ট বিক্রি করেছে। আমরা তো মশাই এখানে এসে আপনার ছেলেমেয়েদের আজব ঘুড়ি দেখে আরও বেশী তাজ্জব বনে গেছি।

আর ইঁদুরটাও কি ফ্যাল্‌না নাকি? একটি কম বয়েসী মেয়ে কলকলিয়ে ওঠে ঃ ইঁদুরদের গায়ে যে ডোরাকাটা দাগ হয়, আর কাঠ-বেড়ালীর মতো লেজ—ও কি কেউ দেখেছে কখনও?

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই অবশ্য ভিড় পাতলা হয়ে এলো। পুলিশ দু'জন যাবার সময় শাসিয়ে গেল,—যা করছেন করুন, কিন্তু আপনা-দের ঐসব আবিষ্কারের জন্য যদি শহরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন ফল ভুগতে হবে আপনাকেই।

মিস্টার হেন্ডারসন, রিপোর্টার লোকটা কী বলে গেছে জানেন? —টমীকে উচ্ছ্বাসে ডগমগ দেখায় ঃ আমাদের সব কীর্তিকলাপ নাকি ফলাও করে ছাপা হবে কাগজে। উঃ, সত্যি এখন আমাদের হাতে হাজার কয়েক ঘুড়ি থাকলে কত লাভ হতো বলুন তো? ডরিস, তোর কাছে ইঁদুর কতগুলো আছে?

আবার সেই ইঁদুর। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। ইঁদুরের জিন্‌-কে ওলটপালট করে কী আজব লেজ-ই না বানিয়েছে ঐ ছোট্ট মেয়েটা।

অসংখ্য বাচ্চা দিচ্ছে ইঁদুরগুলো।—ডরিসও আহ্লাদে আট-খানা ঃ মুশকিল হলো—আমাদের বাড়ীতে আবার এতো ইঁদুর রাখার জায়গা নেই।

একটুও চিন্তা করিস না।—টমী অভয় দেয় ঃ গরম কেকের মতো সব বিক্রি হয়ে যাবে দেখিস। তোর ঐ ইঁদুর কেনার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে।

বস্তুতঃ খবরের কাগজে ঘুড়ি আর ইঁদুরের ছবি ছেপে বেরোনোর পর থেকে ক্রেতাদের ভিড় লেগে গেল আমাদের ওখানে। টমী এদিকে খুচরো বিক্রির বিপক্ষে। প্রত্যেকটা ইঁদুরের ও পাইকারী দাম ধরলো দশ ডলার।

ইতিমধ্যে আমাদের নতুন চেয়ার-টেবিল এসেছে। আউট-হাউসটাকে এখন দিব্যি অফিস-ঘরের মতো দেখায়। দিন কয়েক পর ঐ অফিস ঘরে বসেই চিঠির খসড়া বানাচ্ছি—একজন ফিটফাট যুবক এসে ঢুকলো ঘরে। মাথা থেকে টুপিটা নামিয়ে বললো,—আপনি নিশ্চয়ই ডোনাল্ড হেন্ডারসন। আমি আসছি পেটেন্ট অফিস থেকে। আপনার ছেলে-মেয়েরা যেসব জিনিস বানিয়েছে সেগুলো যাতে অন্যের নকল করে নিজেদের বলে চালাতে না পারে তার জন্য তো পেটেন্ট নিতে হয়। এক একটা আবিষ্কার পেটেন্ট করাতে খরচ মাত্র ষাট ডলার।

টমী তো সঙ্গে সঙ্গে রাজী। পেটেন্ট অফিসের ভদ্রলোক সঙ্গে করে ফর্ম এনেছিলেন। উদ্যোগী দলের ছেলেমেয়েদের হয়ে সই-সাবুদ সব আমাকেই অবশ্য করতে হলো।

পরের দিনই আমাদের সেল্স্ ম্যানেজার টমী—ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক আর লস-এঞ্জেল্স্-এর খেলনা দোকানগুলোয় ঘুড়ির একটা করে নমুনা পাঠালো—সঙ্গে অর্ডার ফর্ম। এক একটা ঘুড়ির দাম যে দেড় ডলার এবং প্রতিটি অর্ডারের সঙ্গে যে এক হাজার ডলার অগ্রিম পাঠাতে হবে সে কথাটা লিখে দিতেও ভুললো না।

সপ্তাহ তিনেক পরের ঘটনা। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। মার্জোরী কফির কাপটা এগিয়ে দিয়ে বললো,—তোমাকে বেশ খুশী খুশী দেখাচ্ছে আজ। কি ব্যাপার?

বললাম,—হিলারীর তৈরি ডিটারজেন্ট আর টমীর বিফোর-শেভ-লোশন-এর পেটেন্ট ছাড়পত্র পেয়ে গেছে।

বিফোর-শেভ-লোশন?—মার্জোরী ভুরু কুঁচকে তাকায়।

আরে, দাড়ি কামানোর আগে মুখে ঐ লোশনটা একবার মেখে নিলেই হলো। দাড়ির ডগাগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। ব্লেডের কোম্পানীগুলো সব এবার ডকে উঠলো বলে!

—বলো কি? পরের দিন সকালে আবার দাড়ি গজাবে তো?

—নিশ্চয়ই। না হলে কেউ কি আর দাড়ি-গোঁফ জন্মের মতো বিসর্জন দিয়ে মাকুন্দ বনতে চায়?

কিভাবে জিনিসটা তৈরি হলো, বলতো।—মার্জোরী জানতে চায়।

একেবারে সাধারণ কেমিস্ট্রির ব্যাপার।—আমি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলি : টমী তো বলছিল—কিস্টিন-থায়ো-ল্যাকটোন না কী যেন নাম ওটার—তার সঙ্গে ম্যাগনেশিয়ামের এক যৌগ মেশালেই লোশনটা বানানো যায়।

তা, ওদের ব্যবসা এবার জমবে বলো?—মার্জোরীকে বেশ উৎফুল্ল দেখায়।

—নিশ্চয়ই। টমী তো আজ আবার ব্যাংকে গেছিল ধারের জন্য। হাইড্রলিক প্রেস কিনতে হাজার বিশেক ডলার চাই। বল্-বিয়ারিং বানানোর কী যে খেয়াল চেপেছে ওর মাথায়! এই তো বর্ষাটা কাটলেই আমাদের অন্য সব জিনিসগুলি তৈরীর কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে।

—বলো কি? তখন তো স্কুল খোলা থাকবে—পড়াশুনোর চাপ—

—পড়াশুনোর আবার চাপ কী? সপ্তাহে ঘন্টাখানেক পড়লেই ওদের পরীক্ষার পড়াটা তৈরি হয়ে যাবে। শনি-রোববারে ওদের কাজটা কী?

না, না—তাই বলে বাচ্চাদের নিয়ে খাটানোটা ভারী অন্যায়। —মার্জোরী খুঁত খুঁত করতে থাকে ঃ আঠারো বছরের নিচের ছেলে-মেয়েদের দিয়ে কারখানায় কাজ করানোটা বেআইনী।

ধ্যাৎ, ওদের দিয়ে কাজ করানোর কথা উঠছে কেন?—আমি বোঝানোর চেষ্টা করি ঃ আসলে, ওরাই তো কারখানার মালিক। আপাততঃ আমি হলাম কারখানার প্রথম মাইনে করা কর্মচারী। তা, মাইনে-পত্তর নেহাৎ মন্দ মিলবে না, বুঝলে?

মার্জোরী হাঁ করে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।